শাইখ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.

এসো কাফেলাবদ্ধ হই



শহীদ শাইখ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম

এসো কাফেলাবদ্ধ হই

অনুবাদ
আবু মুসাব আল শার্যিনাই

সম্পাদনায়
মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম

বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, [illegible]



এসো কাফেলাবদ্ধ হই
শহীদ শাইখ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম

প্রকাশক
এস এম আমিনুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ
মে ২০১৪ ঈ.

প্রচ্ছদ
রাজু আহমেদ

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0070-2

ESU KAFELABODDU HOI : Dr. Abdullah Ajjam : Translate by Abu Musab Al Sorsinai, **Published by :** S M Aminul Islam, **BhoiGhor :** 43 Islami Tower 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100, **First Edition :** May 2014 © by the pablisher

Price : Taka 60 only

উৎসর্গ

আল্লাহর দীন আল্লাহর জমিনে
প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে যারা
জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করেন
তাদের প্রতি...

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। দরূদ ও সালাম পেশ করছি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। এই ছোট কিতাবটি তাদের জন্যে লেখা যাদের অন্তর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাওয়ার জন্যে আকুল; যারা তামান্না রাখেন শাহাদাতের। বইটি মূলত তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে জিহাদের কারণসমূহ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হায় ইসলাম এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে কাফেলাবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব।

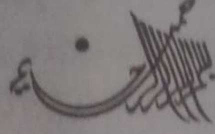
বইটি শেষ করেছি কিছু পর্যবেক্ষণ এবং কিছু রূপরেখা বর্ণনা করার মাধ্যমে। আশা করি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করবেন এবং এর দ্বারা আমাদের সবাইকে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত করবেন। এই বইটি মূলত সেসব ভাইদের জন্যে যারা আমার কাছে চিঠির মাধ্যমে আফগানিস্তান জিহাদে যোগদানের ব্যাপারে উপদেশ চেয়েছেন। সুতরাং চলে আসুন জান্নাতের পথে। কারণ সেটাই সবার আসল আবাসস্থল। মনে রাখবেন, আজ আমরা শত্রুদের হাতে বন্দি। তাই আমাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি দাসত্বকে মেনে নেব না কি গ্রহণ করব জান্নাতকে।

আল্লাহর বান্দা–
আবদুল্লাহ আল-আযযাম
১৭ই সাবান ১৪০৭ হিজরী
১৫ই এপ্রিল ১৯৮৭

সূচিপত্র

বি. দ্র. পুস্তিকাটি শায়খ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.-এর Join The Caravan গ্রন্থের বাংলা রূপ। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় পুস্তিকাটির তৃতীয় পরিচ্ছেদের স্থানে স্থানে সামান্য কিছু সংযোজন করা হয়েছে। আর তা নেয়া হয়েছে– তাফসিরে মা'আরেফুল কুরআন, তাওবার তাফসির, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন, ইসলামী সংগঠন ও পাশ্চাত্য ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্র গ্রন্থ থেকে।

–সম্পাদক



প্রথম পরিচ্ছেদ

জিহাদের কারণসমূহ

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা শুধুমাত্র তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর সাহায্য চাই এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের অন্তরের যাবতীয় কুমন্ত্রণা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার শক্তি কারও নাই। আবার তিনি যাকে বিপথগামী করেন তাকে হেদায়াত করার সাধ্যও কারও নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নাই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল।

হে আল্লাহ! এই দুনিয়াতে কোন কিছুই সহজ নয় যদি আপনি তা সহজ করে না দেন। এবং আপনার করুণায় নিতান্ত কঠিন ব্যাপারও সহজ হয়ে যায়, যখন আপনি ইচ্ছে করেন।

বন্ধুরা আমার!

আজ মুসলিম জাতির এ করুণ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাতকারী যে কোন মানুষ অতি সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে, মুসলমানদের এ দূরবস্থার মূল হচ্ছে জিহাদ ছেড়ে দেয়া, যা হাদীসের ভাষায় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। পথভ্রষ্ট জালিম শাসকরা আজ ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের ঘাড়ের উপর সওয়ার হয়ে বসে আছে। তার প্রকৃত কারণ হল কাফিররা জিহাদ ছাড়া অন্য কিছুতে ভয় পায় না। এদিকে মুসলমানরাও দুনিয়ার পিছনে ছুটে জিহাদকে ছেড়ে দিয়েছে। আর তাইতো মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করেন–

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا.

অতএব, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, যদিও তুমি নিজেকে ছাড়া অন্য কারো জিম্মাদার নও তথাপি মু'মিনদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ কর, হয়তবা এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদেরকে কাফিরদের কবল থেকে মুক্তি দিবেন। কেননা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সবচে' বড় বিপদদাতা এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকারী। *[সূরা নিসা : ৮৪]*

আজ আমরা বিশ্বের সকল মুসলমানকে জিহাদের পথে আহ্বান করছি এবং জিহাদের মাঠে যে তাদেরই আগমনের অপেক্ষা করছি, এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তার মধ্যে কতিপয় কারণ এই–

১. কুফুরী শাসন ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করা।

২. যোগ্য লোকের অভাব।

৩. জাহান্নামের আগুনের ভয়।

৪. জিহাদের মতো একটি ফারজিয়াত আদায়ের লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালার আহ্বানে সাড়া দেয়া।

৫. সালফে সালেহীন বা আল্লাহভীরু পূর্বসুরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

৬. সু-দৃঢ় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্ধর্ষ একটি জানবাজ বাহিনী গঠন করা।

৭. পৃথিবীর নিঃস্ব, অসহায়, মজলুমানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

৮. শাহাদাতের সুমহান মর্যাদা লাভের আশায়।

৯. জিহাদ উম্মতের জন্যে ঢালস্বরূপ এবং তাদের উপর থেকে মর্যাদাহানীর গ্লানিকে উপড়ে ফেলার একটি উপায়।

১০. মুসলমান উম্মতের মর্যাদা রক্ষা করা এবং উম্মাহর শত্রুদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা।

১১. পৃথিবীর প্রতিরক্ষা বিধান করা এবং দুর্নীতির কালো ছোবল থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা।

১২. ইসলামের ইবাদতের স্থান এবং পবিত্র ভূমিসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১৩. শাস্তি থেকে মুক্তির আশা।

১৪. উম্মতের কল্যাণ এবং তার সম্পদের সমৃদ্ধি।

১৫. জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া।

১৬. জিহাদ সর্বোত্তম ইবাদত এবং এর মাধ্যমে একজন মুসলিম অর্জন করতে পারে সর্বোচ্চ মর্যাদা।

১৭. পৃথিবী থেকে ফেৎনা ফাসাদ দূর করার একমাত্র মাধ্যম হলো জিহাদ।

১৮. ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যমই হলো জিহাদ।

১৯. সকল কুফরী মতবাদকে ধ্বংস করে ইসলামী খেলাফত কায়েম করা।

২০. বিশ্বের বুকে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের ও ইসলামের শত্রুদেরকে চিরতরে বিনাশ করে মুসলমানদেরকে গোটা বিশ্ব রাজত্ব করার নিমিত্তে এবং পরকালে জান্নাতের সুউচ্চ আসনের আশায় আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করা। এছাড়াও আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করার আরো অনেক কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ : কুফরী শাসন ব্যবস্থার মূলোৎপাটন

যাতে করে কাফেররা আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। কুফরী শাসন ব্যবস্থাকে চিরতরে বিনাশ করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের আয়াত অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই; মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ বা লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার দীন সম্পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণ করেছেন। *[সূরা আনফাল : ৩৯]*

সুতরাং যদি জিহাদ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কাফিরদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করবে এবং ফিতনা ছড়িয়ে পরবে যা মূলত শিরক। তাই তোমাদের দুশমন কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাক যতক্ষণ না তাদের একতা ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তাদের সকল শক্তি ও শান-শওকত সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং দীন ইসলাম সমস্ত বাতেল ধর্মের উপর বিজয় অর্জন করবে। অতঃপর যখন তারা কুফরী থেকে ফিরে আসবে তখন তোমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের আমলকে প্রত্যক্ষ করেন।

দ্বিতীয় কারণ : যোগ্য লোকের অভাব

বর্তমানে ইসলামী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে দায়িত্বভার বহনে উপযুক্ত এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করে সৎ ও যোগ্য এমন ব্যক্তিত্বের। সহীহ বুখারীতে এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে– মানুষের উদাহরণ হচ্ছে এমন শত কোটি উটের মত, যার মধ্যে একটি সওয়ারী পাওয়াও দুষ্কর। *[সহীহ বুখারী]*

আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি তার সাথের বিশিষ্ট সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বলেন– 'তোমাদের প্রত্যেকের একটি করে ইচ্ছার কথা বল!'

এরপর প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করলেন। এরপর সাহাবাগণ বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনার ইচ্ছার কথাও আমাদেরকে বলুন।

এবার আমিরুল মু'মিনীন বললেন– আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, আমার কাছে আবু উবায়দার মত সম্পদে পরিপূর্ণ একটি ঘর হোক। অর্থাৎ আমিও আবু উবায়দার মত প্রচুর সম্পদ ব্যয় করে জিহাদে সাহায্যকারী, গোলামদের মুক্তকারী এবং সম্পদকে কল্যাণের কাজে ব্যয়কারী হতে চাই। (আবু উবায়দা রা. হলেন সেই ব্যক্তি যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্যে বিশ্বস্ত একজন সাহাবী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন।) এমন মানুষ কম আছে যারা উপলব্ধি করে। আর যারা কাজ করে এমন মানুষের সংখ্যাতো আরও কম। যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেন তারা অসাধারণ এবং দুর্লভ। আর যারা এই পথে অবিচল থাকে তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

একদা আমি কুরআনের এক জলসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে বহু দূর থেকে ইজ্জত, বুজুর্গী, বরকত ও নিয়ামতের জমিনের দিকে আগমনকারী কিছু তরুণ বসা ছিল। এখানে আমার উদেশ্য, আফগান জিহাদে আগমনকারী আরবগণ।

> *ক্ষমতা উৎকর্ষের পিঠে চড়েই আগমন করে*
> *এবং উৎকর্ষ সাধন হয় বিনিদ্র রজনিতে*
> *দীর্ঘ ভ্রমণের মাধ্যমে*

আমি সেসব তরুণদের চেহারার দিকে তাকালাম এজন্য যে, তাদের মধ্য থেকে কোন উত্তম কুরআন তেলাওয়াতকারী খুঁজে পাই কি না; তবে তাকে এ জলসার আমীর বানিয়ে দেব। কিন্তু আফসোস, আমি এরকম একজনকেও খুঁজে পেলাম না। এমতাবস্থায় আমি আর একথা না বলে পারছি না যে, 'আমরা আমাদের

জাতির সাথে ইনসাফ করিনি।' ঠিক যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যখন আনসারদের মধ্য থেকে সাত তরুণকে শহীদ করা হয়েছিল তার চোখের সামনে উহুদের যুদ্ধের দিন।

আমাদের ছাত্র সমাজ এবং গুরুজনেরা জিহাদে যোগদানের উদ্দেশ্যে এখনও এই পথে আসছেন না। যেমনটি আমরা তাদের ঈমান ও আখলাক থেকে আশা করেছিলাম। বরং তাদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তি বাধা প্রদান করছে সেই সকল ভাইদের যারা সামনে এগিয়ে এসে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে চায়। যদিও বাধা প্রদানকারী ঐ মানুষগুলো অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার, অবিচার এবং অন্যায়ভাবে শোষণের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করার ক্ষমতা রাখেন না। তাছাড়া তাদের মধ্যে কেউ কেউ বোকার মত না জেনে একতরফা প্রচার করছে যে, আফগানিস্তানে মানুষের প্রয়োজন নেই বরং প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মালের (অর্থ-কড়ির)। আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের আফগানে অতিবাহিত দিন ও রাতসমূহের শপথ করে বলছি, আমি আফগানিস্তানে যতটা সম্পদের সংকট পেয়েছি তার চেয়ে বহুগুণ বেশী প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি যোগ্য কর্মীর; আর মুবাল্লেগীনদের প্রয়োজনীয়তা তো অপরিসীম। হ্যাঁ আমি একথা বলছি যে, এমন সংকটময় অবস্থায় মুজাহিদীনদের মাঝে আমি সুদীর্ঘ ছয়টি বছর অতিবাহিত করার পর এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমার কথা যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে আসুন আফগানিস্তানের পাহাড়ী উপত্যকায় একবার ঘুরে দেখে যান। যেখানে এমনও এলাকা রয়েছে হন্যে হয়ে খুঁজেও এমন একজন পাওয়া যাবে না যে শুদ্ধমত কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। এরপর চলুন অন্য এলাকাতে, সেখানে আপনি দেখতে পাবেন পুরো এলাকায় এমন একজন লোক বিদ্যমান নেই যে জানাজার নামায সঠিকভাবে পড়াতে পারে। এ কারণে অনেক সময় মুজাহিদ ভাইদের তাদের শহীদ সাথীদের লাশ কাঁধে নিয়ে পাড়ি দিতে হয় মাইলকে মাইল পথ; শুধুমাত্র তার জানাজার উদ্দেশ্যে।

অনুরূপভাবে জিহাদের ফিকহি আহকাম, যার দ্বারা গনিমতের মাল বণ্টন, বন্দিদের সাথে আচার ব্যবহার ইত্যাদি ছাড়াও এরকম অসংখ্য বিষয়ে শরীয়তের বিধানাবলী স্পষ্ট না জানার কারণে সেখানকার বেশির ভাগ মুজাহিদ ভাই তাদের অজানা বিষয়সমূহের সমাধানকল্পে এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে অনেক দূর দূরান্তের এলাকায় পাড়ি জমাতে হয়, যেখানে এ সকল ফিকহি বিষয়ে সমাধান দেওয়ার মত আলেম রয়েছেন।

আর সেখানে সহজ সরল নম্র-ভদ্র, ধৈর্যশীল, ধর্মভীরু, সাদাসিধে জিহাদী চেতনাসম্পন্ন আরব তরুণদের সাক্ষাৎ মিলেছে। তারা নিজ নিজ ফ্রন্টে এমন বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পেশ করছেন যা কিনা উচ্চ শিক্ষিতদের থেকেও পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। অথচ তাদের অনেকেই শুধুমাত্র মেট্রিক পাশ ছিলেন।

আমার যথেষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এখানে স্বল্পপরিসরে সকল ঘটনাসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে সক্ষম নই; আর এটা সত্যিকার অর্থে সম্ভবও নয়। আমি শুধুমাত্র উপমাস্বরূপ আব্দুল্লাহ, আনাছ, আবু দাজানা, আবু আছিম, আবু তাহির– এই ক'জন মুজাহিদের নাম উল্লেখ করব। আর যদি আপনাদের আবু শোয়াইব উম্মীউল আরাবী সম্পর্কে ঐ সকল ঘটনাবলী জানাই যা পাগমানের ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ে খোদিত থাকবে চিরকাল। তবে আপনি পাথরের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে যাবেন এবং আপনার ইন্দ্রিয়গুলোর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। এ ঘটনা যদি আপনি দাঁড়িয়ে শুনেন তবে দাঁড়িয়েই থাকবেন আর যদি বসে শুনেন তবে বসেই থাকবেন, যা শুনে আপনার বাকশক্তি হারিয়ে যাবে। তবুও আপনার কিংকর্তব্য বিমুখতার সমাপ্তি ঘটবে না।

আমাদের আজ ঐ সকল ভাইদের নিকট অনেক আশা-ভরসা, যারা অদ্যাবধি সামাজিক বন্ধনের মায়ার খাচায় বন্দি হয়ে আছেন, এই মায়ার খাচা ভেঙ্গে বের হতে পারছেন না। যারা নিজ গর্দান থেকে গোলামীর শেকল খুলে ছুঁড়ে ফেলতে পারেন নি এখনও। আর পাশ্চাত্যের আক্রমণের কারণে যারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাপে জর্জরিত।

এই ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ, যদি তারা পারিবারিক ও সামাজিকতার শিকল ভেঙ্গে জিহাদের এই ময়দানে সশরীরে যোগদান করতে অপারগ হয়, তাহলে অন্তত যেন তারা সেসব ভাইদের জন্যে মন খুলে দোয়া করেন, যাদের শরীর জিহাদের ময়দান থেকে দূরে থাকলেও অন্তর জিহাদের ময়দানে উড়ে বেড়ায়। হে আল্লাহ! যে পবিত্র ভূমিতে শাহীদদের আত্মা উড়তে থাকে, দৌড়-ঝাপ ও সাঁতার কাটতে থাকে, তাদের তুমি সশরীরে সেই পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত করে দাও।

একদিন আমি সহকর্মী কাজী মাসুদকে বললাম, 'আমাদেরকে সদ্য শহীদ হওয়া আবু আসিম-এর জীবন বৃত্তান্ত বলুন, যিনি আপনাদের মধ্য হতে আন্দার নামক স্থানে শহীদ হয়েছেন।'

তিনি বললেন– আমি প্রভাব-প্রতিপত্তি, গাম্ভীর্যতা, দৃঢ়তা ও দুঃসাহসিকতায় এমন দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্যাৎ পাইনি। যার প্রভাবের কারণে তার উপস্থিতিতে আমার কথা বলার সাহসও পেতাম না; এমনকি পা ছড়িয়ে আরাম করেও তার সামনে

বসতাম না। আর ঠাট্টা তামাশা তো দূরের কথা। এখন মজার ব্যাপার হল, যদি আমি আপনাকে এই কথা বলি যে, আবু আসিম যিনি এতটা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি শুধুমাত্র মেট্রিক পাশ ছিলেন এবং তার বয়স ছিল মাত্র তেইশ বছর। আর তিনি ছিলেন কুরআনে হাফেজ। ব্যাপারটা অদ্ভূত লাগছে, তাই না! সুতরাং এখন সময় এসেছে সত্যিকার মানুষ চিনে নেয়ার। আর জিহাদের ময়দান হচ্ছে এমন একটি জায়গা যেখানে কথায় নয়; বরং কাজ দ্বারা মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়।

একটি ছন্দ–

ভুলে যাও অপহৃত/ উঁচু হয়ে থাক গম্বুজের কথা
আমিতো আমাদের সাওয়ারির খবর জানতে চাচ্ছি

উপরে উল্লিখিত এই ছন্দটি উমর আল-কাইস-এর তৈরি করা একটি ছন্দ। এটি একটি রূপক বাক্য যা এমন মানুষদের উদেশ্যে করে বলা হয়েছে যারা আসল কাজকে ফেলে রেখে অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বাক্যটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে সচেতন করা তাদের কাজের ব্যাপারে। মানুষের যেই সময় যেই কাজটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেই সময় সেই কাজ করার তাগিদ দেয়া হয়েছে এই বাক্যে।

আর নিশ্চয়ই আজ মুসলমানেরা নির্যাতিত, নিপীড়িত এবং তাদেরকে ঘিরে রেখেছে ভয়াবহ দুর্যোগ। সুতরাং খাওয়ার আদব কি এবং কথা বলার আদব কি এই বিষয় নিয়ে এখন কথা বলা বন্ধ করে আসল বিষয় নিয়ে কথা বলাটাই শ্রেয়। এই বিষয়ে কোন শিশুও যদি চিন্তা করতে শুরু করে তাহলে তার চলাফেরা হয়ে যাবে বয়োজ্যেষ্ঠদের মত। বন্ধুগণ, বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ও ঘোলাটে হয়ে গেছে। তাই আমাদেরকে ক্বারী আছিমের মত দৃঢ়চেতা ঈমানের অধিকারী হতে হবে। হতে হবে নির্ভীক বাহাদুর। তবেই আমরা অর্জন করব ব্যাপক কার্যক্ষমতা, আর আমরা সক্ষম হব মুসলমানদের বড় বড় সমস্যাসমূহ সমাধানে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন, আমিন!

তৃতীয় কারণ : জাহান্নামের আগুনের ভয়

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে কারিমে বলেছেন–

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা (আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে) বের না হও তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন; অথচ তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর আল্লাহ পাক সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। *[সূরা তাওবাহ : ৩৯]*

ইবনে আল আরাবী বলেন, ভয়াবহ শাস্তি হিসেবে পৃথিবীতে এমন করা হবে যে, মুসলমানদের শত্রুদেরকেই মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে; আর জিহাদের হুকুম অমান্য করার কারণে পরকালের শাস্তি হিসেবে ভোগ করতে হবে অনন্তকাল জাহান্নাম। *[তাফসীরে কুরতুবী : ৮/১৪২]*

ইমাম কুরতুবী বলেন– এই আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে জিহাদ তখন সকল মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায় যখন কাফিররা মুসলিম উম্মতের উপর বিস্তর আধিপত্য লাভ করে এবং যখন তারা মুসলমানদের সাথে তীব্র যুদ্ধে জড়িত থাকে। যা বর্তমান সময়ে বিশ্বের সব ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করছি। বর্তমানে মুসলমানরা প্রতি মুহূর্তে কাফের বেঈমানদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। কাফের মুশরিকরা মুসলমানদের সাথে যেখানে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে সেসময় আমাদের উপর যুদ্ধ করা ফরজ ওয়াজিব সব কিছুই হয়ে গেছে। আর ঘরে বসে থাকার সময় নেই। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا
فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.
فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

নিশ্চয়ই যারা পাপ কাজের মাধ্যমে নিজেদের উপর অত্যাচার করে তাদের প্রাণসংহার করার সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে আমরা এ ভূখণ্ডে অত্যন্ত অসহায় ছিলাম। ফেরেশতাগণ বলে, আল্লাহ তায়ালার দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে? তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম আর তা কত মন্দ বাসস্থান। কিন্তু যে সমস্ত দুর্বল পুরুষ-নারী হিজরত করতে সক্ষম না হয়, যারা কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং যারা পথেরও কোন সন্ধান পায় না তাদের কথা স্বতন্ত্র। এমন লোক সম্পর্কে আশা আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত মার্জনাকারী, অতিশয় ক্ষমাশীল। আর যে

ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পথে হিজরত করে সে লাভ করবে বহু বিস্তৃত স্থান এবং স্বচ্ছলতা এবং যে ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে এজন্য বের হয়ে আসে যে, সে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করবে, অতঃপর তাকে মৃত্যু আক্রমণ করে, এমন অবস্থায় তার সওয়াব আল্লাহ তায়ালার নিকট অবধারিত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়াময়। *[সূরা নিসা : ৯৭-৯৯]*

ইমাম বুখারী রহ. হযরত ইকরামা (রা.)-এর সনদে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমাকে হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কিছুসংখ্যক মুসলমান মুশরিকদের বস্তিতে বসবাস করতেন। যে কারণে বদরের যুদ্ধের সময় বের হতে পারেননি। এতে করে মুশরিকদের সংখ্যাধিক্য মনে হচ্ছিল। আর মুসলমানগণ যখন তীর ছুঁড়ত তখন মুশরিকদের মাঝে অবস্থানরত মুসলমানদের গায়ে বিদ্ধ হতো। ফলে তারা আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতো।

এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করেন, ফেরেশতা তাদের রূহ কব্জা করার সময় ঐ সকল লোক নিজেদের উপর জুলুমরত ছিল। এমনিভাবে কতিপয় মু'মিন যারা মক্কাতে অবস্থান করছিল অথচ তারা দীনের উপর মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরত করেনি। ফলে বদরের যুদ্ধের দিন কাফেরদের ভয়ে ও লজ্জায় তারা মাঠে বেরিয়ে আসে। এতে কাফেরদের দলের সংখ্যা ভারী হয়ে যায়। অতঃপর যুদ্ধে মুসলমানদের আঘাতে তাদের মধ্য হতে যারা মারা যায় বুখারী শরীফের বর্ণনানুযায়ী তারা জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়েছে। নিঃস্ব অসহায়দের এ পরিণতি জানার পর তাদের সম্পর্কে এখন আপনার মতামত কি? যারা নামে মাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে কাফিরদের অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্টতম মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। যারা নিজেদের ইজ্জত, সম্মান ও সম্পদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপকারী ও হাত উদ্যতকারীর হাতকে ফিরিয়ে দিতে বা গুঁড়িয়ে দিতে পারে না। এমনকি তাদের ঐ শক্তিও নেই যে তাদেরকে যদি শাসক গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত দাড়ি কর্তন করতে বলে, তবে তারা তাদের মনোরঞ্জনের খাতিরে তা করতে বাধ্য। অন্যথায় দাড়ি রাখার মাধ্যমে ইসলামের সাথে তার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ করার কারণে শাসকরা তাদের শত্রুতে পরিণত হবে।

শুধু তাই নয়, তাদের অবস্থা এর চেয়েও আরো অধিকতর নাজুক; তারা যদি শরীয়তের বিধানানুযায়ী নিজেদের স্ত্রীদের পোশাককে লম্বা করতে চায় বা স্ত্রীদের পর্দা করাতে চায় তবে এতেও তারা অক্ষম। কেননা এটাও তাদের দেশে এক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, যে অপরাধের কারণে তাদেরকে উল্টো করে লটকানো হয়। এছাড়াও তাদেরকে আরো বিভিন্ন রকমের শাস্তি প্রদান করা হয়। তাদের করুণ পরিণতির এটাও একটি অংশ যে, তারা আল্লাহর ঘরে বসে তিনজন যুবককে একসাথে কুরআন শিক্ষা দিতে পারে না। কেননা তাদের দেশে এটা অবৈধ সমাবেশ, যা কিনা অমার্জনীয় অপরাধ। এমন কি কিছু সংখ্যক ইসলামী রাষ্ট্রেও তারা নিজেদের স্ত্রীদের কেশ আবৃত করে রাখতে পারে না। আর না পারে সেই ইন্টেলিজেন্সের কুকুরগুলোকে নিজেদের অবলা যুবতী নারীর হাত ধরে নিয়ে যেতে বাধা দিতে। ধরণী আঁধারের চাদর মুড়ি দেওয়ার সাথে সাথে তাকে যেখানে খুশি সেখানে বলপূর্বক টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। এ বেচারী হৃদয়ে মাজলুমিয়্যাতের পূর্বাকৃতি অংকন করা ও তার বাস্তবতার অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। বিষয়টি যদি কোন লোক সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করেন, তবে যথার্থই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এটা কেমন নিঃসঙ্গতা!

তারা কি আল্লাহদ্রোহী শাসকদের পরিচালিত কোন বিধানকে পালন করতে অস্বীকৃতি জানানোর কোন সৎ সাহস দেখাতে পারবে? এমন আদেশ যা শুধুমাত্র স্বৈরাচারী শাসকদের মানস-কামনা চরিতার্থ করতেই বলা হয়েছে। লাখ লাখ লোক কি এমন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে না? এমতাবস্থায় ফেরেশতারা যদি তাদের আত্মা কব্জা করে নেয় তবে প্রমাণিত হবে যে, এরা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচারী। ঐ সকল লোকদের একটু ভাবা উচিত, যখন ফেরেশতা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমরা কোথায় ছিলে?' তখন তাদের উত্তর কি হবে? তারা কি তখন বলবে যে, আমরা পৃথিবীতে দুর্বল নিঃস্ব অসহায় অনাথ এবং নির্যাতনের স্বীকার ছিলাম।

অথচ তাদের মনে রাখা উচিত, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দুর্বলতা কোন গ্রহণযোগ্য অজুহাত নয়। বরং এটা এমনই এক অপরাধ যার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। আল্লাহ শুধু ঐ সকল মানুষকে অক্ষম ও অপারগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যারা বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন অথবা অবুঝ শিশু এবং নারী। কেননা এ সকল মানুষ মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় না এবং সম্মানের পবিত্র ভূমির পথও চিনে না। যারা না পারে দারুল ইসলামের দিকে হিজরত করতে আর না পারে জিহাদী কাফেলার সাথে সঙ্গ দিতে।

...আমি আমার মুখ সরিয়ে নেব সেই ভূমি থেকে

যা আমার বাক-স্বাধীনতাকে করেছে হরণ,
অন্তরকে করেছে বন্দি
একজন পুরুষের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সাধারণ স্বভাব,
নির্দেশ দেয় মুখ ফেরাতে,
যখন মুখে আঘাত করে সূর্যের তীর্যক রশ্মি ...

আমি পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে বলছি যে, জিহাদ এবং জিহাদের দিকে হিজরত মূলত এই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যার মধ্য হতে কোন অংশকে ধর্মের মৌলিকতা থেকে পৃথক করা যায় না। যে ধর্মের মধ্যে জিহাদ নেই বাস্তবে সে ধর্ম না পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে আর না ধর্মের পুষ্পমালা প্রস্ফুটিত করতে পারে। বরং জিহাদই হচ্ছে ধর্মের মূল শক্তি। বিশ্ব স্রষ্টার কাছে যার মূল্য অনেক।

জিহাদকে শুধুমাত্র ইসলাম প্রচার কাজে প্রয়োজন মনে করার কোনই অবকাশ নেই। বরং জিহাদ ঐ কাফেলার সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় উপাদান যারা ধর্মের চূড়ান্ত লাক্ষ্যার্জনে সদা তৎপর। উস্তাদ শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব রহ. তাফসির ফি যিলালিল কুরআন-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৪২ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন– জিহাদ যদি উম্মাতে মুসলিমার জীবনে আকস্মিক অল্পসময়ের কোন প্রয়োজন হত তবে কুরআনুল কারীমের প্রতি পারায় পারায় জিহাদ নিয়ে এত ব্যাপক হারে আলোচনা করা হত না। সুতরাং জিহাদকে আকস্মিক প্রয়োজন কিভাবে সাব্যস্ত করা যেতে পারে? ঠিক একইভাবে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অধিকাংশ সময় জিহাদের ব্যাপারে তার সাহাবিদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে এবং সন্তুষ্টচিত্তে এ কাজকে আঞ্জাম দেয়ার প্রতি এত গুরুত্বারোপ করা হতো না। যদি জিহাদ কোন পর্যায়ে আকস্মিক প্রয়োজনই হত, তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত অবধি আগত সকল মুসলমানের জন্য এ অসিয়ত রেখে যেতেন না– যে ব্যক্তি জীবনে কোনদিন যুদ্ধ করেনি এবং কখনো যুদ্ধের কল্পনাও করেনি এমতাবস্থায় সে যদি মারা যায় তবে সে মুনাফিকের ন্যায় মৃত্যু বরণ করল। *[সহীহ মুসলিম]*

মহান আল্লাহ তায়ালার ভালো করে জানা যে, জিহাদ এমন একটি কাজ যা সকল শাসকের কাছে অপছন্দ হবে। আর ক্ষমতাধর শাসক ও তাদের অনুসারী এ বিধানের বিরোধিতা করবে। কেননা এ পদ্ধতি ও রীতি নীতি তাদের নিয়ম নীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর এ পদ্ধতি শুধু বর্তমানকালে নয় বরং এটা পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে মুসলিম জাতির সকল প্রজন্মে এবং প্রত্যেক যুগেও ভিন্নই ছিল এবং ভবিষ্যতেও তাদের থেকে ভিন্ন ও তাদের বিরোধীই থাকবে। মহা

কৌশলী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক একথা খুব ভালো করেই জানতেন যে, কুচরিত্রের ব্যক্তিদের নিকট থেকে ভালো এবং ন্যায়-নীতির আশা করা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা তারা কল্যাণের চারা গাছকে এভাবে হেলে দুলে বড় হতে ও সজীব হয়ে ডালপালা ছড়াতে কখনই দেবে না। তারা সত্য এবং কল্যাণের বিজয় দেখে সর্বদাই ঈর্ষান্বিত হয়। এর প্রধান কারণ হল, কল্যাণের বীজ বৃদ্ধি পেলে অকল্যাণের অস্তিত্বের জন্যে বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, হকের অস্তিত্বও বাতিলের জন্যে বিপদ সংকেত। এতে কোনই সন্দেহ নাই যে, এমতাবস্থায় বাতিল হকের ঘোর শুক্রতে পরিণত হয় এবং বাতিল নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে হককে জোরপূর্বক নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রয়াশ চালায়। হক এবং বাতিলের এ লড়াই কোন ক্ষণস্থায়ী বিষয় নয়।

এটা চির বাস্তব কথা
এটা সাময়িক চিত্র নয়
এটা জন্মগত সমস্যা
এটা ক্ষণস্থায়ী সমস্যা নয়।

সুতরাং জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম এবং এটাও ধ্রুবসত্য যে, ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে জিহাদের এ শ্রোতধারাকে সর্বাবস্থায় সর্বকালে অব্যাহত রাখতে হবে। সুতরাং সশস্ত্র শত্রুর মুকাবেলায় জিহাদ করার জন্যে এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত কাফিরদের ছুটে আসা বাহিনীর মুকাবেলা করার জন্যে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যুগ-উপযোগী অস্ত্রের যোগান দিতে হবে। বসে থাকলে হবে না চৌদ্দশ' বছর আগের তরবারির দিকে। বরং আধুনিক সমরাস্ত্র আগ্নেয়াস্ত্র এবং এর চেয়েও জটিল জিনিসের ট্রেনিং নিয়ে তাদের মোকাবেলা করতে হবে। কাফের বেঈমানরা যে শক্তি ব্যবহার করবে তার মোকাবেলায় তার সমতুল্য বা তার চেয়ে শক্তিধর কিছু ব্যবহার করতে হবে। বাতিলকে প্রতিহত করতে হকেরও থাকতে হবে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। অন্যথায় এ কাজ আত্মহত্যায় পরিণত হবে। আর তা এমন এক ঠাট্টা মনে হবে যা মুমিনের মহাচরিত্রের সাথে শোভা পায় না।

আমি জুলুমকারীদের নিন্দা করি না
তারা তো করবেই আক্রমণ
প্রস্তুতি নেয়া আমাদের কাজ
রুখতে হবে এই আগ্রাসন—

চতুর্থ কারণ : জিহাদের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করার লক্ষ্যে আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেয়া

মহান রাব্বুল আলামীন তার পবিত্র কালামে বলেন–

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অথবা ভারী সরঞ্জাম নিয়ে, নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে থাক, এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। [সূরা তাওবা : ৪১]

বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী (রহ.) তার তাফসীরে কুরতুবীর ৮ম খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে দশজন বিখ্যাত মুফাসসিরের দশটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপ–

১. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য 'যুবক এবং বৃদ্ধ।'

২. ইবনু আব্বাস (রা.) এবং কাতাদাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের দ্বারা সতর্ক এবং অসতর্ক লোকদের বুঝানো হয়েছে।

৩. মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে এই দুই শব্দের (হালকা ও ভারী) তরজমা এভাবে করেছেন যে অর্থাৎ সম্পদশালী (যার জীবন যাপন করা সহজতর) এবং ভারির তরজমা হবে ফকির মিসকীন– যার উপর জীবন যাপন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

৪. শাইখ হাসান বসরি রহ. এর মতে 'যুবক অথবা বৃদ্ধ'।

৫. যায়েদ ইবনু আলী এবং হাসান ইবনু উতাইয়বা বলেন যে, এর দ্বারা 'ব্যস্ত' এবং 'অবসর' মানুষকে বুঝানো হয়েছে।

৬. ইবনু যায়েদ (ভারীকে) মনে করেন, যে কোনো ব্যক্তি এমন কাজ করেন যা ছেড়ে দেয়া তার জন্যে কষ্টকর ব্যাপার। আর (হালকাকে) মনে করেন, যে ব্যক্তি কোন কাজই করে না।

৭. যায়েদ ইবনু আসলাম (ভারীকে) মনে করেন, যার সংসার আছে। আর (হালকাকে) মনে করেন যার সংসার নেই।

৮. ইমাম আওযায়ী (রহ.) মনে করেন এরা হচ্ছে লড়াইকারী 'পদাতিক সিপাহী' আর 'অশ্বারোহী।'

৯. অন্য এক তাফসীরে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ সকল লোক যারা যুদ্ধে সর্বপ্রথম বের হয়, অর্থাৎ সেনাবাহিনীর 'অগ্রগামী দল' আর হচ্ছে 'সৈন্যের বাকী অংশ।'

১০. ইমাম নাক্কাশ (রহ.) হালকার তরজমা করেছেন 'বাহাদুর' এবং ভারীর তরজমা করেছেন 'ভীতু।'

মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষকে সমষ্টিগতভাবে এ আদেশ করেছেন যে, 'বের হয়ে পড় স্বল্প (হালকা) বা প্রচুর (ভারী) সরঞ্জামের সাথে।'

হাদীসে বর্ণিত আছে, একদিন উম্মে মাকতুম রা. (তিনি ছিলেন অন্ধ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমারও কি জিহাদে (যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করা ফরজ?'

জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন, এ আদেশের মাধ্যমে অন্ধদের অন্তরে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ তাদের এ অক্ষমতাকে মেনে নেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে এ হুকুম থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

এ আলোচনা শুধুমাত্র আয়াতে উল্লিখিত ঐ দু'টি শব্দ হালকা ও ভারির উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন বিবেকবান ও চৌকস ব্যক্তির এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন এবং পৃথিবীর ঐ সকল মুসলিম জনপদে নির্যাতনে জর্জরিত, নিষ্পেষিত অসহায় মুসলমানদের উপর এ আয়াত প্রকাশ্য ঘোষণা। আর এ আয়াতের বিধান আমাদের সকলের উপরও আরোপিত হয়েছে। এতে হালকা অথবা ভারী উভয় অবস্থায় বের হওয়ার আদেশ করা হয়েছে।

এ কথার উপর পৃথিবীর সকল মুফাসসিরীন, মুহাদ্দেসীন, ফোকাহায়ে কেরাম এবং শাইখুল উলামা ও সকল নীতিনির্ধারকগণ একত্রিত হয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যখন শত্রু কোন ইসলামিক ভুখণ্ডে আক্রমণ চালায় অথবা এমন কোন ভূমিতে আক্রমণ চালায় যা আগে ইসলামের আওতাধীন ছিল, তবে সেই আক্রান্ত রাষ্ট্রের মুসলমানদের অবশ্য করণীয় হলো শত্রুর মোকাবেলা করার জন্যে আল্লাহর পথে সর্বস্ব নিয়ে বেরিয়ে পরা। আর যদি তারা অলসতার কারণে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকে এবং শত্রুকে প্রতিরোধ করতে না পারে, তবে এ ফরজ হুকুম পার্শ্ববর্তী জনপদবাসীর উপর স্থানান্তরিত হয়। তারাও যদি কোন কারণে শত্রুকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে শত্রুকে প্রতিহত করার দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয় তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণের উপর। আর ঠিক এভাবে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। আর যখন জিহাদ এভাবে ফরজে আইন হয়ে যায় তখন সালাত এবং সাওমের মতই জিহাদকেও ত্যাগ করার কোন অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ তখন ছেলে-পিতার অনুমতি ছাড়া, ঋণী গ্রহীতা ঋণদাতার অনুমতি ছাড়া, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি

ছাড়া এবং গোলাম নিজের মালিকের অনুমতি ব্যতীতই জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়।

জিহাদের এই ফরয হুকুম ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে যতদিন মুসলিম ভূখণ্ডগুলো কাফিরদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে এর পবিত্রতাকে ফিরিয়ে দেয়া না হয়। আগের কথার প্রসঙ্গ ধরে এখানে উল্লেখ্য যে, নারীদের কোন সফরে যোগ দিতে হলে তার সাথে অবশ্যই মাহরাম থাকতে হবে।

আমার এই স্বল্প পরিসরের জীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে আজ অবধি এমন কোন ফেকাহ, হাদীস ও তাফসীরের কিতাব দেখিনি, যে কিতাবে জিহাদ ফরজে আইন অবস্থায় জিহাদে শরীক হওয়ার ব্যাপারে পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র কিংবা মালিকের অনুমতির শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে।

জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের গর্দান থেকে এর গুনাহ সেই পর্যন্ত দূর হবে না, যতদিন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের এক ইঞ্চি জমিতেও কাফিররা অধিপত্য বিস্তার করবে। তবে হ্যাঁ, এ গুনাহ হতে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তি মুক্ত থাকবে যে ইখলাসের সাথে উক্ত জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে।

সুতরাং আজ এই পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দান থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে সে তার একটি অবশ্য কর্তব্যকে অবহেলা করছে। এবং তার অবস্থা ঠিক ঐ লোকের মত যে কোন উজর ছাড়াই রমজান মাসের রোজা ছেড়ে দিল কিংবা বিশাল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করল। বরং জিহাদ পরিত্যাগকারী ব্যক্তির পরিণতি এদের চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ এবং গুনাহ অনেক গুণ বেশি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, দীন এবং দুনিয়াকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আক্রমণকারী শত্রুর মোকাবেলা করা ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য)। এর চেয়ে বড় আর কোন ফরজ ও ওয়াজিব হুকুম নেই। [ফাতওয়া আল-কুবরা : ৪/৫২০]

এটা সূর্যালোকের ন্যায় পরিষ্কার সত্য যা থেকে কেউ মুখ সরিয়ে নিতে পারবে না, আর সেটা হল আবু তালহা (রা.)-এর মুখের একটি বাণী; তিনি বলেন– 'যুবক হও অথবা বৃদ্ধ হও, আল্লাহ কারো কোন উজর কবুল করবেন না।'

অতঃপর তিনি তার ছেলেদের লক্ষ্য করে বললেন– 'হে আমার ছেলেরা! আমাকে প্রস্তুত করে দাও।'

ছেলে তাকে লক্ষ করে বলল, 'আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন।' আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় সর্বদা তার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর জামানায়ও তার

সাথে জিহাদের ময়দানে ছিলেন এবং হযরত উমর (রা.)-এর জামানাতেও সর্বদা তার সাথে জিহাদে শরীক ছিলেন। এখন আপনি জিহাদের উপযুক্ত নন; বরং এখন আমরা আপনার পক্ষ থেকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত। এ নিয়ে আপনার পেরেশান হওয়ার কি প্রয়োজন?

এই কথা শুনে আবু তালহা (রা.) বললেন- না! না! আমাকে প্রস্তুত করে দাও।

এরপর তিনি প্রস্তুত হলেন এবং মুজাহিদীনদের এক নৌ-কাফেলার সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। সফরকালীন অবস্থায় সমুদ্রেই তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। তখন সাথীরা তাঁকে দাফন করার জন্য দীর্ঘ সাতদিন পর্যন্ত খুঁজেও কোন দ্বীপের সন্ধান পেলেন না। এরপর দীর্ঘ সাতদিন পর যখন তাকে কোন দ্বীপে দাফন করা হয় তখনও তাঁর শরীর পূর্বের মতই তরতাজা ছিল, এর মাঝে কোন প্রকারের পরিবর্তন সাধিত হয়নি। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আমিন!

ইমাম কুরতুবী (রহ.) তার ঐতিহাসিক গ্রন্থ তাফসীরে কুরতবীর অষ্টম খণ্ডের ১৫১ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রের কোন কোন এলাকা বা অঞ্চলের কোন ভবনে শত্রুরা যদি নামমাত্রও আঘাত হানে তবে সেই অঞ্চলের সকল অধিবাসীর উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। আর তাদের অপারগতায় এলাকার লোকদের উপরও জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের কর্তব্য যে হালকা হোক বা ভারী হোক, যুবক হোক অথবা বৃদ্ধ হোক, প্রত্যেকে যার যার শক্তি নিয়ে বের হবে। যাদের পিতা-মাতা জীবিত নেই তারাও বের হবে, আর যাদের পিতামাতা বেঁচে আছেন অনুমতির অপেক্ষা না করে তারাও আল্লাহর পথে বেরিয়ে আসবে। বের হতে সক্ষম এমন লোক যেন পিছনে পড়ে না থাকে, চাই সে ভারী হিসাবে বের হোক, চাই হালকা হিসাবে বের হোক। অতঃপর শহরের বাসিন্দারা যদি শত্রুর মোকাবেলা করতে না পারে, তবে তার নিকটবর্তী অঞ্চলের মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য হল শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য বেরিয়ে আসা। সেই সাথে নিজ এলাকাবাসীকে শক্তি সঞ্চয় ও শত্রুর মোকাবেলায় বেরিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করা।

এমনিভাবে যদি কোন মুসলমানের কাছে এ সংবাদ পৌছে যে, মুসলিম বাহিনীর শক্তি খুবই দুর্বল এবং পরাজিত হওয়ার আশংকা রয়েছে, এমতাবস্থায় সে মুসলিম যদি নির্যাতিত মুসলমানদের যেকোন উপায়ে সাহায্য করতে সক্ষম হয়, তবে তার উচিত তাদের সাহায্যের জন্যে বেরিয়ে পড়া। কেননা সকল মুসলমান শত্রুর সামনে একই শরীরের ন্যায় একটি দুর্ভেদ্য শক্তি। এমনিভাবে শত্রু

কবলিত অঞ্চলের অধিবাসীরা শত্রুকে পরাস্ত করে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হলে এই ফরজ অন্যদের উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে যদি শত্রুবাহিনী দারুল ইসলামে আক্রমণ করতে তাদের সৈন্য বাহিনী নিয়ে উদ্যত হয় এবং দারুল ইসলামের সীমান্তের নিকট চলে আসে, যদিও সীমান্ত অতিক্রম করে দারুল ইসলামের ভেতরে প্রবেশ না করে তথাপি সীমান্ত রক্ষার জন্যে ঐ শত্রুকে প্রতিহত করতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ হয়ে যায়। যেন আল্লাহর দীন বিজয় লাভ করতে পারে, মুসলিম জাতি বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়, ইসলামী সীমান্ত নিরাপদ থাকে এবং শত্রুরা পরাস্ত হয়। আর এ ব্যাপারে কারও মধ্যেই কোন মতানৈক্য নেই।

বিশিষ্ট কবি আল-যা'দিনের স্ত্রী তাকে অনুরোধ করেছিল জিহাদের ময়দানকে পরিত্যাগ করে পরিবারের সাথে সময় কাটাতে। তিনি কত সুন্দর করেই না এর উত্তরে বলেছিলেন–

সে বসেছিল বিনিদ্র রজনীতে অশ্রুসিক্ত চোখে
আটকাতে আমায় সে পথ হতে
আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে যাতে,
হে প্রেয়সী! এ তো আল্লাহর হুকুম সামনে এগিয়ে যাওয়ার,
যদি ফিরে আসি তবে এই ফিরে আসার প্রশংসা আল্লাহর
যদি ফিরতে না পারি রবের ডাকে
তবে জীবন গড় নতুন করে।
আমায় তো আজ যেতেই হবে, যেতেই হবে সেই জমিনে।

পঞ্চম কারণ : আল্লাহভীরু পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণ

জিহাদ ছিল সালফে সালেহীনদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মুজাহিদদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তিনি ছিলেন সেই সময়কার সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের আদর্শ। সৈন্যদলের মূল অংশের কমান্ডার ছিলেন তিনি। যুদ্ধ যখন ভয়ংকর রূপে পরিণত হত এবং সাহাবায়ে কেরাম যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুর তীরবৃষ্টি ও আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে সারি বেঁধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুর একেবারে নিকটে পাওয়া যেত।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোট যুদ্ধের সংখ্যা হচ্ছে ২৭টি। যে সকল যুদ্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে অংশ নিয়েছেন তার সংখ্যা হচ্ছে ৯টি। অর্থাৎ বদর, উহুদ, মুরাইসী, খন্দক, বনী কোরাইযা, খায়বার, মক্কাবিজয়, হুনাইন এবং তায়েফের যুদ্ধ।

অবস্থা এরকম দাঁড়ায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনের মধ্যে মক্কার জীবনের পর দশ বছরের মদীনা জীবনে ২৭ বার যুদ্ধের ময়দানে বের হন এবং ৪৭টি সারিয়া (ছোট সৈন্যদল) প্রেরণ করেন। আর এর মাধ্যমে ইসলাম ও জিহাদের মাঝে পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের কথা এবং জিহাদের প্রয়োজনীয়তাও দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায়।

লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, খুব বেশি হলে দুই মাস অন্তর অন্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন না কোন সারিয়া পাঠাতেন। অথবা স্বয়ং নিজেই যুদ্ধের জন্যে বের হতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পদ্ধতির উপরই সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবন পরিচালিত।

ইমাম হাকিম তার মুসতাদরাক কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৫ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেন– হযরত আসরাম আবু ইমরান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কুসতুনতুনিয়ার অবরোধের সময় জনৈক মুহাজির শত্রুব্যূহ ভেদ করে অনেক ভেতরে চলে যায়। আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) আমাদের সাথে ছিলেন। তার সামনে কোন এক ব্যক্তি পর্যালোচনা করলেন যে, সে নিজেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বলে উঠলেন, এ আয়াত সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশী জানি। এ আয়াত আমাদের উপর ঐ সময় অবতীর্ণ হয়েছে যখন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহু যুদ্ধ করার পর ইসলামের বিজয় অর্জিত হয় এবং ইসলাম বিস্তার লাভ করে।

একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে আমরা কতিপয় আনসার পরস্পর এ আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের কতই না সৌভাগ্য যে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর রাসূলের সংস্পর্শে ধন্য করেছেন। এখন ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ সফলতা লাভের জন্যে আমাদের পরিবার পরিজনকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং নিজেদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততির অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! এখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আমরা

পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরই মাঝে দিনাতিপাত করব। আমরা যখন এই আলোচনা করছিলাম ঠিক তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়–

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজের হাতে নিজের জীবনকে ধ্বংস ও মুসিবতের দিকে ঠেলে দিও না; আর সৎকাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নেককার লোকদের পছন্দ করেন। *[সূরা বাকারা : ৯৫]*

মূলত ধ্বংস এটাই ছিল যে, আমরা নিজেদের পরিবার পরিজন এবং সম্পদের মাঝে থেকে যাওয়া এবং জিহাদ ছেড়ে দেয়া। ধ্বংসের অর্থ এটা নয় যে, কোন ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শন করতে করতে শত্রুদের মাঝে ঢুকে পড়বে। *[ইমাম হাকিম তার মুসতাদরাক কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৫ নং পৃষ্ঠায় এটি উল্লেখ করেন]*

হযরত ইকরামা (রা.) বর্ণনা করেন, 'যামরাতু বনুল আঈস' হলো সে ব্যক্তি, যে ছিল নিপীড়িত, নির্যাতিত এবং মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল ও অসুস্থ। এমতাবস্থায় যখন তিনি জানতে পারলেন মহান আল্লাহ তায়ালা হিজরত সম্পর্কে আয়াত নাজিল করেছেন, তিনি তখন বললেন– আমাকে এ অঞ্চল থেকে বের করে অন্যত্র নিয়ে চল। এরপর তার জন্যে একটা বিশেষ বিছানার ব্যবস্থা করা হল এবং তার ওপর তাকে শোয়ানো হল। আর সেই বিছানায় করে তাকে বাইরে নিয়ে আসা হল। তবে মক্কা থেকে বেশি দূরে নিতে পারলেন না, মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে যাওয়ার পর 'তানঈম' নামক স্থানে তাঁর ইন্তেকাল হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)গণ এ আয়াতের মর্মকে কেমনভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এর জীবন অতিবাহিত করতে কতই না পছন্দ করতেন। *[তাফসীরে কুরতুবী : ৫/৩৪৯]*

ইমাম তাবারী (রহ.) তার এক নিকটম বন্ধু থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন– এক বন্ধু মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ নিজের অতিশয় মোটা ও ভারী দেহের অনুপাতে উর্দির অর্ডার দিচ্ছিলেন। তাবরী (রহ.)-এর বন্ধু মেকদাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাল আছেন তো? জবাবে মেকদাদ বললেন, অন্য কিছু নয় জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছি। তখন তিনি পুনরায় বললেন, আল্লাহ তো আপনার এ ওজরকে (অতিশয় মোটা দেহ) কবুল করেছেন, তারপরও কেন এ কষ্ট স্বীকার? জবাবে মেকদাদ বললেন, আমাদের ঘর থেকে বের হওয়ার আদেশ সূচক আয়াত এসেছে। বের হও, যদিও তুমি হালকা অথবা ভারী।

ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, 'সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব জিহাদের উদ্দেশে বের হয়েছেন অথচ তার একটি চক্ষু পূর্বেই আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে। পথিমধ্যে তাকে দেখে একজন বললেন, আপনি তো জিহাদ করতে অক্ষম, আপনি বিশ্রাম করুন, যুদ্ধে বের হওয়ার জন্যে আপনি ছাড়া আরো বহুলোক রয়েছে।

জবাবে তিনি বললেন, না! আল্লাহ তায়ালা হালকা এবং ভারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হতে বলেছেন। যদি আমি যুদ্ধ করতে সক্ষম না হই তবে মুসলিম বাহিনীর ক্যাম্প পাহারা দেব। তাও যদি না পারি তবে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা তো বাড়াতে পারব।

এক বর্ণনায় জানা যায়, আস-শাম (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জরদান, ফিলিস্তিন)-এ জিহাদ চলাকালে ময়দানে জনৈক ব্যক্তি একজন শুভ্র দাড়িওয়ালা বৃদ্ধকে দেখতে পান। তিনি ছিলেন এমনই বৃদ্ধ যে তার চোখের পাপড়িগুলো ঝুলে ছিল চোখের ওপর। এমন একজন বৃদ্ধকে জিহাদের ময়দানে দেখে সেই ব্যক্তি অবাক হন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, চাচাজান, আল্লাহ তো আপনার অক্ষমতাকে কবুল করেছেন। তারপরও কেন আপনি জিহাদের এ অসহনীয় কা[illegible] সহ্য করার জন্য বের হয়েছেন?

উত্তরে তিনি বললেন, ভাতিজা! আল্লাহ আমাদের যুবক-বৃদ্ধ উভয় অবস্থায় বের হওয়ার আদেশ করেছেন। *[তাফসীরে কুরতুবী : ৮ নং খণ্ডের ১৫১ পৃষ্ঠা]*

প্রিয় পাঠক, একটু চিন্তা করুন হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহ.)-এর কথা, যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন আর বুঝতে পারলেন যে তার মৃত্যু সন্নিকটে, তখন তিনি বললেন, আমার ধনুকটিতে যুদ্ধের জন্যে তীর লাগিয়ে প্রস্তুত করে দাও। এরপর তিনি তার সেই ধনুকটি হাতে নিয়েই ইন্তেকাল করলেন। তার মৃত্যু এমনভাবে হয় যে, তার সেই ধনুক হাতেই মজবুতভাবে ধরা ছিল। ইন্তেকালের পর তাকে রোম দেশের এক দ্বীপে দাফন করা হয়। *[তারীখে দামেস্ক, আল্লাম ইবনু আসাকীর, ভলিয়ম : ২ পৃষ্ঠা : ১৭৯]*

লক্ষ্য করুন! আবদুল্লাহ ইবনে আল মুবারাক (রহ.)-এর দিকে, যি[illegible] বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের ভৌগোলিক সীমান্তে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহে অংশগ্রহণের জন্যে দুই হাজার ছয়শ' কিলোমিটার পথ অতিক্র[illegible] করেছেন, যার কিছু পথ পায়ে হেঁটে এবং কিছু পথ সওয়ারীর উপর আরোহ[illegible] করে এসেছেন। *[আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক : ড. মুহসিব থেকে]*

যুবায়ের ইবনে কুমাইর আল-মারযোবি (রহ.) বলেন, চল্লিশ বছর ধরে স[illegible] জেগেছে গোশত খাওয়ার। কিন্তু আমি গোশত খাই না; কারণ আমি প্রতি[illegible] করেছি, ততদিন পর্যন্ত গোশত মুখে নিব না, যতদিন না আমি রোমে প্রবে[illegible]

করছি এবং সেখানে জিহাদে প্রাপ্ত গনিমতের মাল বকরী থেকে গোশত আহার করতে পারছি। *[কিতাবুল মুদারেক, কাজী ইয়াজ থেকে, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৪৯]*

কুফার বিখ্যাত কাজী উরুয়া ইবনু যা'আদ তার বাড়িতে সত্তরটি ঘোড়াকে সর্বদা সাওয়ারির জন্যে প্রস্তুত রাখতেন জিহাদের উদ্দেশ্যে। *[তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত : ১/৩৩১]*

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং মুহাদ্দিস। তিনি অনেক জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জিহাদের সম্মুখভাগের অকুতোভয় সৈনিক ছিলেন। জিহাদে নেতৃত্ব দানকারী সেনাপ্রধান কুতায়বাহ ইবনে মুসলিম আল বাহিলী তার সম্পর্কে বলেন, আমার কাছে জিহাদের ময়দানে হাজার হাজার পরিচিত তরবারি আর শক্ত-সামর্থ যুবকদের মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসির আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরা তর্জনি অধিক প্রিয়। *[আল মাশুক ফিল জিহাদ : পৃষ্ঠা ৬৬]*

আহমদ ইবনে ইসহাক সুলামী (রহ.) বলেন, আমার এই তরবারি দিয়ে আমি হাজারো কাফের হত্যা করেছি। যদি এটা বেদআত না হত তাহলে এই তরবারিটিকে আমার মৃত্যুর পর কবরে আমার সাথে দিয়ে দেয়ার অসিয়ত করে যেতাম। *[তাহজীব আল তাহজীব ইবনে হাজার আসকালানি : ১/১৪]*

আহমদ ইবনু ইসহাক সুলামী (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু ক্বাদুসের (রহ.) ঘটনা, যিনি স্পেনের খৃষ্টানদের কাছে মরণজয়ী অকুতোভয় যোদ্ধা হিসাবে প্রসিদ্ধ। সুতরাং কোন একদিন জনৈক খৃষ্টান তার ঘোড়াকে পানি পান করার জন্য নদীতে নিয়ে গেলে ঘোড়াটি পানি পান না করে নদী থেকে মুখ উঠিয়ে ফেলল। এমতাবস্থায় সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘোড়াকে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার! পানি পান করছ না কেন? পানিতেও কি ইবনু ক্বাদুসের চেহারা ভেসে উঠেছে? যার ভয়ে তুমি পানি পান করা ছেড়ে দিয়েছো? *[আলমাশুক ফিল জিহাদী : পৃ. ৭৭]*

বদরউদ্দীন আম্মার (রহ.)-এর কাহিনী, যিনি নিজের চাবুকের আঘাতে সিংহকেও বশ করে ফেলতেন। এ বীরত্ব দেখেই মুতানাব্বী তার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন।

তিনিতো সেই বীর,
যিনি চাবুক দিয়ে সিংহকে করেছেন শেষ।
কিয়ামত অবধি থাকবে বাকী,
তার এই বীরত্বের লেশ।

এবং এরপর চলে আসে ওমর আল মুখতার-এর কথা, এই বীর সম্পর্কে তৎকালীন ইটালির সেনাপ্রধান গিরাসিয়ানি বলেন, সে আমাদের সেনাবাহিনীর

বিপক্ষে বিশ মাসে প্রায় দুইশ' তেষট্টিটি ছোট ছোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তার পুরো জীবনে তিনি এক হাজারের মত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

শাঈখ মুহাম্মাদ ফারগালীর (রহ.) ঘটনা, যখনই ইংরেজরা জানতে পারত যে, ফারগালী শহরে প্রবেশ করেছেন তখনই তারা পুরো শহরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করত এবং সেনা ছাউনিতে সাইরেন বাজিয়ে বিপদ সংকেত জানিয়ে দিত। তৎকালীন ইংরেজরা তাকে জীবিত অথবা মৃত গ্রেফতার করে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল পাঁচ হাজার পাউন্ড।

সুইজখালের তীরে বাঁধা ইংরেজ নৌবহরে আক্রমণকারী ইউসুফ তাল'আতকে 'ইংরেজ খেকো' নামে অভিহিত করা হতো। কারণ তিনি ইংরেজদের কসাইয়ের ন্যায় কর্তনকারী ছিলেন। প্রেসিডেন্ট নাসির তার আমেরিকান মনিবদেরকে খুশি করার জন্যে তাঁকে গ্রেফতার করে ফাঁসি দিয়ে দেয়।

আহমাদ শাহ মাসুদের এক কর্মী 'মুহাম্মদ বানার' আমাকে বলেছিল যে, তিনি স্বীয় বাহিনী নিয়ে সালাং ঘাঁটিতে আক্রমণ করে প্রায় চারশ'র মত রাশিয়ান গাড়িবহর ধ্বংস করে দেন। রাশিয়ানরা তাকে 'জেনারেল মুহাম্মদ বানা' নামে সম্বোধন করত। মুহাম্মাদ বানা আমাকে বলেছিলেন যে, একবার তিনি সর্বমোট ১৫০ ট্যাংক উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং দখল করে নিয়েছিলেন প্রায় ২০০ এ কে ৪৭ এবং এ কে এস ৭৪ ইউ অস্ত্র।

বন্ধুরা আমার!

এটা হলো আমাদের পূর্বসূরীদের সুন্নাত। পৃথিবীর ইতিহাস রচনাকারী, বিশ্ববিজয়ী, দুঃসাহসী ও অকুতোভয় মহানবীর মুজাহিদদের পথ। এ পথেই কি আমরা পরিচালনা করব না আমাদের জীবন?

ষষ্ঠ কারণ : সুদৃঢ় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে দুর্ধর্ষ জানবাজ বাহিনী গঠন

এ কথাটি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীর বুকে একটি শরীয়া ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। পানি এবং বাতাস ছাড়া যেমন মানুষের জীবন কল্পনা করা যায় না তেমনি ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া মুসলমানদের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। আর এ কাঙ্ক্ষিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা জিহাদের ধ্বনিকে বুলন্দকারী এবং জিহাদি কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী ও রণাঙ্গনে রক্তের বন্যা প্রবাহকারী কোন সুশৃঙ্খল ইসলামী সংগঠন ছাড়া সম্ভব নয়। কোন ইসলামী সংগঠনই জিহাদের পদ্ধতি

ব্যতীত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তথা ইসলামী রাষ্ট্রের রূপদানের মহান দায়িত্ব আদায় করতে সক্ষম নয়।

ইসলামী সংগঠনের উদাহরণ এমন যার কর্মীদের জিহাদী কার্যক্রম হৃদয় প্রকম্পিতকারী এবং সুদৃঢ় পরিকল্পনাকারী হবে। অথবা এমন যে, ক্ষুদ্র একটি ইলেক্ট্রিক স্টাটারের ন্যায়, যে নিজের বিন্দু পরিমাণ বিদ্যুৎ দিয়ে বড় বড় মর্টার চালাতে সক্ষম। এই ইসলামী সংগঠন এ বিশাল জাতির প্রাথমিক শক্তি অর্জন করবে এবং পরবর্তীতে তার গভীরে কল্যাণের বীজ বপন করবে।

আপনি অবশ্যই জানেন যে, কায়সারের প্রভাব প্রতিপত্তিকে মাটির সাথে একাকারকারী এবং কিসরার সিংহাসনকে ধ্বংসকারী সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সর্বমোট সংখ্যা বর্তমান মুসলিম জাতির তুলনার নিতান্তই কম ছিল।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফত আমলে যে গোত্র বিদ্রোহ করে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, ওমুর বিন খাত্তাব (রা.) সেই গোত্রকেও পারস্যের সাথে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন, তাদের ক্ষমা মঞ্জুর করার পর। সেই গোত্রের নেতা তালহা ইবনে খাওয়াইলিদ আল আসাদি- যে পূর্বে নিজেকে নবী দাবী করেছিল- সে ক্ষমা প্রার্থনা করে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করার পর মুসলমান সেনাদলের হয়ে বীরত্বের পরিচয় রাখে। সেই সময়কার মুসলমান সেনাদলের সেনাপতি সাদ (রা.) তালহা ইবনে খাওয়াইলিদ আল আসাদিকে পারস্যের সেনাদলের গোপন তথ্য সংগ্রহের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। যা তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পালন করেন।

আজকের জিহাদ পরিচালনায় হাতে গোনা কয়েকজন আমির রয়েছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, তাদের পক্ষে খুব সহজেই একটি সার্বজনীন সফল ইসলামী আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই ধারণা হল অলীক কল্পনা এবং নিজেদের সাথে প্রতারণার সামিল, যা স্মরণ করিয়ে দেয় অতীত ইতিহাস। আব্দিল নাসেরের ইসলামিক আন্দোলনের দুঃখজনক পরিণতির কথা এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে।

আমাদেরকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, জিহাদী কার্যক্রমের সুদীর্ঘ পথের পথিকদের অসংখ্য মুসিবতের তিক্ততাকে আস্বাদন করতে হয়। ত্যাগ ও কুরবানী নজরানা পেশ করতে হয়। লাশের স্তুপ মাড়িয়ে নিজের যাত্রা অব্যাহত রাখতে হয়। ফলে তাদের হৃদয় পবিত্র হয়ে উদার হয়ে যায়। দুনিয়াবী ছোট খাটো ফাসাদ মিটে যায়। অন্তর থেকে বস্তুর লোভ শেষ হয়ে যায় এবং পরস্পরের বিদ্বেষ মিটে যায়।

অতঃপর হৃদয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে চমকাতে থাকে এবং কাফেলা নিচু পথ বর্জন করে সুউচ্চ চূড়ার দিকে যাত্রা শুরু করে। সে উচ্চ চূড়া যার মধ্যে মাটি তো দূরের কথা মাটির গন্ধও নেই এবং বনের ঝাড়-জঙ্গল কিছুই নেই।

আর মনে রাখতে হবে, জিহাদের পথে সৎ নেতৃত্বের দ্বারাই একমাত্র সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। ত্যাগ ও দান খয়রাতের মাধ্যমে নিজেদের সুপ্ত যোগ্যতার বিকাশ ঘটে এবং পুরুষের পৌরুষত্ব ও বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই তো বলা হয়েছে–

সম্মান নেইকো নাচে গানে,
আছে মর্যাদা বিনিদ্র রজনী ও রণে।

লক্ষ্য বস্তুর উন্নতির ফলে মানুষের দৃষ্টিও ছোট ছোট বস্তু থেকে দূর হয়ে বড় বড় বস্তুর দিকে পরিবর্তন হয় এবং এ বড় বড় কাজের কামনা ও আকাঙ্ক্ষাই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

যখন কুড়াতে নেমেছ সম্মান, লুণ্ঠিত গৌরব
তখন লক্ষ যেন হয় আকাশ ছোঁয়ার, শহীদের সৌরভ
বিছানা কিংবা জিহাদের ময়দান, মৃত্যুর স্বাদতো একই
তবে কেন এই কাপুরুষতা, কতকাল দেবে ফাঁকি।

সামাজিকতার চরিত্রও ঠিক পানির মত। যেমনিভাবে আবদ্ধ পানিতে জন্ম নেয় ময়লা দুর্গন্ধ ও রং বেরংয়ের কষ্টদায়ক কীট-পতঙ্গ, নাপাক প্রাণী। অপর দিকে প্রবাহমান পানিতে কোন দুর্গন্ধ থকে না। আটকে থাকে না কোন মৃত প্রাণী। তেমনিভাবে হাত পা গুটিয়ে জড় পদার্থের ন্যায় নীরব থেকে সমাজেও নেতৃত্বের শীর্ষ চূড়া স্পর্শ করা সম্ভব হবে না। কেননা আন্দোলন, পরিশ্রম, ত্যাগ ও কুরবানীর পথ অতিক্রম ব্যতীত তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

কেননা খুলাফায়ে রাশেদীন ও ইসলামী রাষ্ট্রের সুমহান দায়িত্ব পালন ও অবিস্মরণীয় ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা পেশ করা ব্যতীত সম্মুখে আসতে পারেননি। তাইতো আবু বকর (রা.)কে নির্বাচিত করার সময় কোন নির্বাচনের প্রয়োজন পড়েনি; বরং জাতি নিজেরাই তাঁর নেতৃত্বের উপর একমত হয়ে যায়। বরং যখনই রাসূল (সা.)-এর পরমাত্মা জান্নাতে সর্বোত্তম বন্ধুর সাথে মিলে গেছে তখনই সকলের সন্ধানী দৃষ্টি ময়দানে বিচরণ করতে থাকে এবং মাঠে আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে উত্তম আর কাউকে তাদের দৃষ্টি সন্ধান করে পায়নি। তারপরও এ বাস্তব সত্যকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়?

যে জাতি জিহাদ করে তাদেরকে চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হয় এবং চড়া মূল্যের বিনিময়েই তারা হাতিয়ে নেয় সুমিষ্ট পাকা ফল। যা তাদের থেকে

ছিনিয়ে নেয়া অত সহজ নয়। কেননা এ ফল লাভের আশায় কত রক্ত আর কত ঘাম ঝরাতে হয় তার কোন হিসাব থাকে না। তার মোকাবেলায় সেই সামরিক বিপ্লব যা কিনা শুধুমাত্র দূতাবাসের যোগসাজসেই হয়ে থাকে এবং মানুষের মধ্যে এর প্রভাব বিস্তারের জন্যে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে বক্তৃতা বিবৃতির সাহায্য নিতে হয়, এর ভিত্তি তত মজবুত হয় না এবং এ শক্তি খর্ব করাও অতীব সহজতর।

যখন যুদ্ধবিহীন কোন ভূ-খণ্ড দখল হয়,

তখন প্রয়োজনে সেই ভূ-খণ্ড ছেড়ে দেয়াও সহজ হয়।

তার হুবহু বিপরীত জিহাদের এ সুদীর্ঘ কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রমকারী অকুতোভয় বীরদের নেতৃত্ব। জান্নাতের পথে সফরকারী জিহাদী জাতিকে পথ থেকে দূরে হটিয়ে দেয়া এবং নিজ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বানিয়ে দেয়া অথবা ইসলামী সালতানাতের সিংহাসনকে উল্টিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা অত সহজ নয়। তেমনিভাবে জিহাদের এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়া এবং সুশৃঙ্খল কাফেলার সদস্যদের মন-মগজে সন্দেহের বীজ বপন করাও অত সহজ নয়। তাছাড়া এ কষ্ট ও দুঃখ যাতনার জিহাদী আন্দোলন উম্মতে মুসলিমাকে ঐ চেতনায় উজ্জীবিত করে যে, তারা সকলেই একতাবদ্ধ; তাদের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই, তাদের সকলের সম্মিলিত পরিশ্রমেই অর্জিত হয়েছে এ কাঙ্ক্ষিত সফলতা।

আফগানিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্যয় করা সকল ত্যাগ ও কুরবানীতে সকলেই সমানভাবে শরীক রয়েছে। সুতরাং এ অনুভূতির সুফল হিসেবে তারা নবপ্রতিষ্ঠিত সকল সমাজ তথা রাষ্ট্রের রক্ষক। উম্মতে মুসলিমার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যয় করার পরই জন্ম লাভ করেছে এ ইসলামিক সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রবাহিত করতে হয়েছে রক্তের সমুদ্র, এর সাথে সাথে পোহাতে হয় দুঃখ যাতনার ঝড়-তুফান। আর জিহাদের এ অক্লান্ত পরিশ্রম উম্মতে মুসলিমার পাক বদন থেকে অলসতা ও অবহেলার ভাবকে স্রোতের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

সপ্তম কারণ : পৃথিবীর অসহায় মজলুম মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো

হ্যাঁ ভাই!

ইসলামী জিহাদের সুমহান লক্ষ্যগুলোর মধ্য হতে মজলুম দুর্বল নির্যাতিত নিপীড়িত ও অসহায় মানুষের ওপর তা বন্ধ করে তাদের অবিচারের মূলোৎপাটন

করে আল্লাহর আইন দ্বারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। *[সূরা নিসা : ৭৫]*

মুসলমান নারীদের খুবলে খাচ্ছে,
কালো পিশাচের দল
এরপরেও শান্ত কেন, হে মুজাহিদের দল?
কোথায় হারালো তোমাদের সেই শক্ত বাহুবল।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না এবং অসহায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার জন্যে লড়াই করতে বের হচ্ছো না অথচ তারা তোমাদের চিৎকার করে ডাকছে যেন তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে নির্যাতিত জাতির সাহায্যকারী হিসাবে তাদের সাহায্য কর এবং তাদেরকে অত্যাচারী জনপদ থেকে উদ্ধার কর।

এ কথার উপর সকল ফোকাহায়ে কেরামগণের ঐকমত্য যে, যদি কোথাও কোন মুসলিম নারী শত্রুর হাতে বন্দি হয় অথবা শত্রুর হাতে নির্যাতনের শিকার হয় তাহলে তাকে মুক্ত করতে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। আল বাযাযিয়ায় বর্ণিত আছে, যদি কোন মুসলমান নারী পৃথিবীর পশ্চিম দিগন্তে নির্যাতিত হতে থাকে তখন সেই নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা পৃথিবীর পূর্বদিগন্তের মুসলমানদের ওপরও ওয়াজিব হয়ে যায়।

যদি নাহি থাকে ধর্মীয় চেতনা হৃদয় মাঝে
তবে এসো সম্মানের জন্যে জিহাদের মাঝে,
বলছি তোমায় হে মুসলমান! বন্দি নারীর দোহাই দিয়ে

এসো তুমি তাদেরই আত্মসম্ভ্রমের দিকে তাকিয়ে।
যদি নাহি কর প্রতিদানের কামনা
তবে আর ঘরে বসে থেকো না।
তথাপি গনিমতের জন্যে হলেও হও রওয়ানা।

একদিন আমি আফগানিস্তানের লোগার এলাকাতে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের সাথে ছিলাম। আমরা শত্রু ছাউনিতে আক্রমণ করে ফিরছিলাম। এমতাবস্থায় এক মানবহীন বিরান বস্তি থেকে কতিপয় শিশু শ্লোগান দিয়ে আমাদের স্বাগত জানায় এবং নারীরা হেকমতিয়ারকে আশীর্বাদ দেয়ার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

ভূলুণ্ঠিত হয় যখন মুসলমান নারীর সম্মান
কিভাবে আরামে ঘুমিয়ে কাটাও, হে বিশ্বের মুসলমান!
দলে দলে এসো জিহাদের রাহে, পূর্ণ কর ময়দান
এটাই আল্লাহর হুকুম বটে
তার কাছেই আছে এর প্রতিদান।

অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের এ পৃথিবীতে আজ সে ইসলাম কোথায়? যার আগমন হয়েছিল এ ধরণিতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে! মহান রাব্বুল আলামীন বলেন–

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

আমি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়ে পাঠিয়েছি রাসূলদেরকে, সাথে দিয়েছি কিতাব ও মিযান, মানুষের মাঝে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে। *[সূরা: আল হাদীদ : ২৫]*

অষ্টম কারণ : শাহাদাত এবং জান্নাতের সুমহান মর্যাদা লাভের কামনা

ইমাম আহম্মাদ এবং ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত মেকদাম (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, শহীদগণকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সাতটি পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে।

১. শহীদের শরীর থেকে রক্তের প্রথম কণিকা মাটিতে পড়ার আগেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

২. মৃত্যুর আগেই জান্নাতে তাঁর জন্যে বরাদ্দকৃত আসন সে দেখতে পাবে এবং ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে।

৩. ৭২টি হুরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে।

৪. কবরের আযাব থেকে নিরাপদে থাকবে।

৫. হাশরের দিনের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকবে।

৬. তাঁর মাথায় সম্মানের এমন এক মুকুট রাখা হবে, যে মুকুটের এক একটি ইয়াকূতের মূল্য দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে অধিক।

৭. শহীদ নিজ বংশধর থেকে ৭০ জন লোককে জান্নাতে নেয়ার সুপারিশ করতে পারবে। *[সহীহ আল-জামী : ৫০৫৮]*

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুজাহিদদের জন্যে ১০০টি সোপান প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং প্রতি দুই সোপানের মাঝে আকাশ ও জমিন সমান ব্যবধান। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যে দোয়া কর।

নবম কারণ : জিহাদ ইজ্জতের রক্ষাকবজ

জিহাদ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর ইজ্জতের রক্ষক এবং লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষাকারী। যেমনিভাবে ইমাম আহমদ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে একটি সহীহ হাদীস বর্ণনা করেন; তিনি বলেন–

যখন মানুষ টাকা পয়সা অর্থ কড়ির পেছনে পড়ে যাবে, সম্পদকে ভালবাসতে শুরু করবে এবং সম্পদের মোহে পড়ে অন্ধের ন্যায় নফসের পেছনে পেছনে চলতে থাকবে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের উপর এক কঠিন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা থেকে তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্কৃতি দেয়া হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের দীনের দিকে ফিরে আসে; অর্থাৎ জিহাদের দিকে। [সহীহুল জামী : পৃ. ৬৮৮]

দশম কারণ : জিহাদ প্রভাব-প্রতিপ্রত্তি রক্ষার শেষ তূণীর

জিহাদ মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা রক্ষা করা এবং উম্মাহর শত্রুদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে শান্তি ফিরিয়ে আনার একমাত্র মাধ্যম। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই কর। তোমাদের উপর নিজের জীবন ছাড়া অন্য কারো দায়িত্ব তো নেই ঠিকই তবে মু'মিনদেরকে জিহাদের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত কর। হয়তোবা এর বিনিময়ে আল্লাহ তাদের উপর কাফিরদের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া মুসিবত দূর করে দিবেন। মূলত আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বড় কষ্টদাতা এবং সবচেয়ে বেশী শিক্ষাদাতা। *[সূরা নিসা : ৮৪]*

ইমাম আহমেদ এবং আবু দাউদ হতে একটি সহীহ হাদীসে সাওবান (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে বলা হল– এমন এক সময় আসবে যখন কাফিররা তোমাদেরকে চারপাশ দিয়ে এমনভাবে ঘিরে ধরবে যেমনটা মানুষ রাতের খাবার খেতে বসে খাবারকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে রাখে।

এ কথা শুনে কেউ একজন জিজ্ঞেস করল– হে আল্লাহর রাসুল সা.! এটা কি এই জন্যে হবে যে সে সময় আমরা সংখ্যায় অনেক কম থাকব?

তিনি বললেন, না। বরং তোমাদের সংখ্যা হবে অধিক বন্যার পানির ফেনার ন্যায়। কিন্তু তোমাদের অন্তরের ভেতরে নির্জীবতাকে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে ভয় দূর করে দেয়া হবে। আর এই রকম হবে, দুনিয়ার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করার কারণে।

একাদশ কারণ : পৃথিবীর প্রতিরক্ষা বিধান করা এবং দুর্নীতির কালো ছোবল থেকে রক্ষা করা

জিহাদ হচ্ছে পৃথবীতে শান্তি রক্ষার অন্যতম ধারক বাহক এবং ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষাকারী। আল্লাহ বলেন–

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

যদি আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানব জাতির এক শক্তিকে অপর শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন তবে পৃথিবী ভারসাম্য হারিয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। *[সূরা বাকারা : ২৫১]*

দ্বাদশ কারণ : ইসলামের ইবাদতের স্থানসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন–

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খৃষ্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। [সূরা হজ : ৪০]

ত্রয়োদশ কারণ : শাস্তি থেকে মুক্তি

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা জিহাদের জন্যে বের না হও তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তিতে ফেলে দিবেন এবং তোমাদের স্থলে জিহাদকারী অন্য আরেক জাতি অনয়ন করবেন। অথচ তোমরা তার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, আর আল্লাহ পাক সর্বোপরি সর্বশক্তিমান। *[সূরা তাওবা : ৩৯]*

সুতরাং শাস্তি হতে মুক্তির আশায় জিহাদে যোগদান করা কর্তব্য।

চতুর্দশ কারণ : জিহাদ উম্মতের কল্যাণ এবং রিযিক অর্জনের পথ

জিহাদ মুসলমানদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির কারণ এবং জিহাদেই নিহিত আছে উম্মাতে মুসলিমার ধন ও প্রাচুর্যের গোপন রহস্য।

আমার রিযিক লেখা আছে আমার বর্শার ছায়াতলে। এ হাদীস ইমাম আহমাদ (রহ.) হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। *[সহী আল জামী : পৃ. ২৮২৮]*

পঞ্চদশ কারণ : জিহাদ ইসলামী স্থাপত্যের শীর্ষ চূড়া

হযরত মুয়াজ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এক সহীহ হাদীসে বর্ণনা করেন, জিহাদই হলো ইসলামের শীর্ষ চূড়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিহাদই উম্মতে মুসলিমার বৈরাগ্যতা। তোমাদের উপর ওয়াজিব হল জিহাদ করা আর এ জিহাদই হলো ইসলামের বৈরাগ্যবাদ। এই হাদীসটি 'হাসান।' ইমাম আহমাদ (রহ.) এই হাদীসটি তাঁর মুসনাদ নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভলিয়মের ৮২ নম্বর পৃষ্ঠায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।

ষোড়শ কারণ : জিহাদই সর্বোত্তম ইবাদত

সর্বোত্তম ইবাদতসমূহের মধ্য হতে জিহাদ অন্যতম এবং এর মাধ্যমেই একজন মুসলিম মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছতে পারে। এ ব্যাপারে হযরত ফজল ইবনু যিয়াদ (রহ.) বলেন, একদা আমি ইমাম আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)কে শত্রু সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। শত্রুর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার মত পবিত্র কাজ আর নেই। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, শত্রুর মোকাবেলা করার জন্যে রণাঙ্গনে আগমন করার চেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট আর কোন ইবাদত নেই। অতঃপর সরাসরি নিজে স্বশরীরে রণাঙ্গনে উপস্থিত হওয়া তার চেয়েও উত্তম কাজ।

ঐ সকল মুক্তিপাগল মানুষ যারা শত্রুর সাথে লড়াই করে মূলত তারা ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত রাখে এবং উম্মাতে মুসলিমাকে হেফাজত করে। পক্ষান্তরে বেষ্টনিতে আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট ও যাতনার কবল থেকে চিরমুক্ত। তবুও ভয় তরঙ্গে তাদের জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। তাদের কাছে জীবন ধারণের জন্যে নিজস্ব কোন কর্মসূচি নেই। এবার আপনিই বলুন, তাদের মধ্য হতে কার আমল উত্তম? বুখারীতে আরেকটি হাদীস এসেছে- 'জান্নাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুজাহিদদের জন্যে ১০০টি স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং প্রতি দুই স্তরের মাঝে আকাশ ও জমিন সমান ব্যবধান। /আল-মুগনী : ৮/৩৪৮-৩৪৯/

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই ঘুমন্ত জাতিকে তাঁর রাহে জিহাদ করার জন্য জেগে উঠার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হায় ইসলাম

হে মুসলমান ভাইয়েরা! আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ আপনাদেরকে তার করুণা এবং ক্ষমার চাদর দিয়ে ঢেকে দিক। আমি বলতে চাই যে, আফগানিস্তানের মুসলমান ভাইদের যে অবর্ণনীয় আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবন পরিচালনা করতে হচ্ছে তা নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নয়। দীর্ঘ নয় বছর, সত্যি কথা বলতে যখন থেকে রাশিয়া আফগানিস্তানের দখলদারিত্ব নিয়েছে এবং অত্যাচার শুরু করেছে তখন থেকেই আফগানিস্তানের মুসলমান ভাইয়েরা সহ্য করে যাচ্ছে তীব্র মৃত্যু যন্ত্রণা এবং তারা এই মৃত্যু যন্ত্রণাকে মুখবুঁজে সহ্য করছে তাদের ধর্ম, গৌরব এবং তাদের পরিবারকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আফগানিস্তানের অবস্থা এতটাই করুণ যে সেখানে এখন এমন একটাও ঘর খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে শোকের ছায়া নেমে আসেনি এবং যেটা এতিমখানায় পরিণত হয়নি।

এই মজলুম মানুষগুলো আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর ওজর রয়েছে, তারা তাদের অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পেশ করে। তাদের আত্মা, তাদের পঙ্গুত্ব এবং তাদের রক্তের নালিশ করতে তারা শুধুমাত্র আল্লাহকেই সাক্ষী রাখে।

সময়ের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় আফগান মুসলমানদের অনেক প্রত্যাশা ছিল বিশ্বের মুসলমান ভাইদের ওপর। তারা ভেবেছিল সমস্ত বিশ্ব থেকে দলে দলে মুসলমান ভাইয়েরা এগিয়ে আসবে তাদেরকে সহায়তা করার জন্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হবে আরও মজবুত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি। বরং আফগানের ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া দেখলে মনে হয় যেন পারদ গলিয়ে তাদের কানের ছিদ্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছে; যার ফলে তারা কিছুই শুনতে পায় না। তারা শুনতে পায় না মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর শিশুর আর্তচিৎকার, শুনতে পায় না কুমারিত্ব হরণের পর কুমারী মেয়েদের ক্রন্দন, তাদের কানে এসে পৌঁছায় না মৃত্যুশয্যায় বৃদ্ধ ব্যক্তির দীর্ঘশ্বাস। মুসলমান বিশ্বের কতিপয় ধনী ব্যক্তি সহানুভূতির ছলে তাদের খাবার টেবিলের

উচ্ছিষ্ট এবং খাবারের ছিটেফোঁটা দান করেই যথেষ্ট সাহায্য করে ফেলেছে ভেবে আত্মতুষ্টিতে ভোগে।

অথচ আফগানের পরিস্থিতি বর্তমানে অত্যন্ত সঙ্গিন। সেখানের মুসলমানেরা তীব্র নিপীড়ন, নির্যাতন এবং অসহায়ত্বের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। মহান আল্লাহর রহমতে আফগান ভূমিতে এই পবিত্র জিহাদের সূচনা হয়েছিল ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত গোটা কয়েক যুবক এবং একদল আলেমের হাত ধরে যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করেছেন। এই প্রথম প্রজন্মের প্রায় সবাই শাহাদাত বরণ করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রজন্ম এগিয়ে এসেছে সম্মুখে। কিন্তু সঠিক প্রতিপালন এবং নেতৃত্বের অভাব বরাবরই অনুধাবন করেছে দ্বিতীয় প্রজন্ম। এমনকি তাদের সঠিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে কেউ তাদের জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করছে না। বর্তমানে তাদের এমন একজন নেতা অত্যাবশ্যক যিনি তাদের ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে আল্লাহর রাহে পরিচালিত করবে।

চার মাযহাবের ফকিহগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানে জিহাদ সংঘটিত হচ্ছে তাতে জান এবং মাল দ্বারা সহায়তা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরজে আইন। আর এতে কোনই দ্বিমতপোষণের সুযোগ নেই। অনুরূপভাবে বেশিরভাগ মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিস এবং আলেমও এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেছেন।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, যখন শত্রু বাহিনী কোন ইসলামী ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তখন সেই ভূখণ্ডের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায় সেই স্থানের প্রতিরক্ষা বিধান করা। অতঃপর যদি তারা দুর্বল হয়ে পড়ে তবে তাদেরও আশপাশের মুসলমানদের ওপর দায়িত্ব বর্তায়। এর কারণ সমগ্র ইসলামিক ভূখণ্ড একসাথে একটি রাষ্ট্রের মত। জিহাদ যখন ফরজে আইন হয়ে যায় তখন ছেলে পিতার অনুমতি ব্যতীত, ঋণগ্রহিতা ঋণদাতার অনুমতি ব্যতীত, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং গোলাম নিজের মালিকের অনুমতি ব্যতীতই জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়। ইমাম আহমেদ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। */ফাতওয়া আল কুবরা : ৪/৬০৮/*

তিনি আরও বলেন, যখন শত্রুবাহিনী মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তখন আক্রমণের শিকার প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায় এবং জিহাদ ফরজ হয়ে যায় সেই সকল মুসলমানের ওপর যারা তাদের পাশে অবস্থানরত থাকে। আল্লাহ বলেন– অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের

সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। *[সূরা আনফাল : ৭২]*

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ হল, যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী জান এবং মাল দিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কাফেরদের আক্রমণ হতে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিধান করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য এবং ঈমানী দায়িত্ব। খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন কাফেররা আক্রমণ করেছিল তখন মদীনায় উপস্থিত সকল মুসলমানকে আল্লাহর হুকুমে কাফিরদের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়েছিল, কাউকেই ছাড় দেয়া হয়নি।

এছাড়াও জিহাদের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে চার মাযহাবের ইমামগণ তাদের অবস্থান এতটাই সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করে প্রকাশ করেছেন যে, এতে কোনই অস্পষ্টতা নেই এবং এতে সন্দেহের বা নতুন করে বর্ণনার কোন অবকাশ নেই।

ইবনে আবেদীন একজন বিশিষ্ট হানাফী আলেম বলেন–

যখন শত্রু কোন মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায় অথবা এমন কোন ভূমিতে আক্রমণ চালায় যা আগে ইসলামের আওতাধীন ছিল, তবে সেই আক্রান্ত রাষ্ট্রের মুসলমানদের জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। আর সেই অঞ্চলের অদূরে অবস্থিত মুসলমানদের ওপর তখন জিহাদ ফরজে কিফায়া হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু যদি আক্রান্ত ভূখণ্ডের মানুষেরা পশ্চাদপদতা অবলম্বন করে অথবা ঘরে বসে থাকে, অথবা যদি তারা অলস হয়, অক্ষম এবং অসমর্থ হয় তাহলে তাদের এই দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয় তাদের পার্শ্ববর্তী জনপদবাসীর উপর। তখন তাদের ওপরও জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যদি কোন কারণে তারাও শত্রুকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে শত্রুকে প্রতিহত করার দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয় তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণের উপর। আর ঠিক এইভাবে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে সকল মুসলমানের ওপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। আর যখন জিহাদ এভাবে ফারদুল আইন হয়ে যায় তখন সালাত এবং সাওমের মতই জিহাদকেও ত্যাগ করার কোন অবকাশ থাকে না। *[হাসিয়া ইবনে আবেদীন আল-হানাফি : ৩/২৩৮]*

> *টীকা : [অনুরূপভাবে একই ধারার ফতোয়া প্রদান করেছেন অন্যান্য হানাফী আলেমগণ এদের মধ্যে আল-কাসানী (বাদাই আস-সানাই ৭/৭২), ইবনে নুযাইম (আল-বাহরুর রায়েক ৫/৭২) এবং ইবনে আল হাম্মাম (ফাতহু কবীর ৫/১৯১) অন্যতম। এছাড়াও অন্যান্য মাযহাব-এর আলেমগণও একই মত প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ যেমন মালিকি আল দাসুকি হাসিয়া (হাসিয়া*

২/১৭৪), শাফি আল-রামালি'র নিহায়াতুল মুহতাজ (৮/৫৮), হানবালি ইবনে কুদামা-এর আল মুঘনি আল-মুঘনি ৮/৩৪৫]

এত কিছুর পরও অনেকেই জিহাদে যোগদানের জন্য এগিয়ে আসছে না। তারা আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু আফগান মুজাহিদীনদের অনিয়ম এবং তাদের ইসলামী প্রশিক্ষণের অভাবকে জিহাদে যোগদান না করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের মতে সঠিকভাবে শরীয়া মেনে আফগানে জিহাদ পরিচালিত হচ্ছে না বিধায় তারা জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে। তবে এ ধরনের অমূলক আজুহাত খণ্ডন করার জন্যে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে ফুকাহাদের মতে, জিহাদ করা ফরজ; এমনকি যদি কোন পাপিষ্ঠ সেনাদলের সাথে যোগ দিয়ে তা করতে হয় এবং এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আদর্শ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর দীনের হেফাজত করেন একই সাথে ধর্মভীরু এবং গুনাহগার বান্দাদের মাধ্যমে। কোন কোন সময় এমন মর্যাদাহীন ব্যক্তিদের দিয়ে আল্লাহ তাঁর দীনকে সাহায্য করেন যাদের কোন নৈতিকতা নেই। বস্তুত পূর্বেকার এবং বর্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের দেখানো পথ এটাই। বরং পাপিষ্ট সেনাদলের সাথে কিংবা অত্যাচারী-দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকের অধীনে জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জানানো হুরুরিয়াদের (খারিজিদের একটি ভাগ) স্বভাব। জ্ঞানের অভাবের কারণে মানুষ নিরর্থক অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে। *[মাজমুয়ায়ে ফাতোয়া ইবনে তাইমিয়া : ২৮/৫০৬]*

আরও কিছু মানুষ রয়েছে যারা জিহাদে যোগ না দেয়ার অজুহাত পেশ করে এই বলে যে, তাদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং বেড়ে ওঠার জন্যে তাদের নিজেদের দেশে অবস্থান করা প্রয়োজন। তাদের জন্যে আল-যুহরির বর্ণিত ঘটনাটিই যথেষ্ট।

আল-যুহরি বলেন : সাইদ ইবনে আল মুসাইব তার এক চোখ অন্ধ অবস্থায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে একজন বললেন, আপনি তো জিহাদ করতে অক্ষম!

তিনি উত্তরে বললেন, না! আল্লাহ তায়ালা হালকা এবং ভারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হতে বলেছেন। যদি আমি যুদ্ধ করতে সক্ষম না হই তবে মুসলিম বাহিনীর ঘাঁটি পাহারা দিব। তাও যদি না পারি তবে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা তো বাড়াতে পারব।

সুতরাং বিশিষ্ট তাবেয়ীগণ যদি এভাবে জিহাদের ময়দানে ছুটে আসেন তাহলে আমাদের জিহাদে যোগদান না করে নিজের দেশে আরামে জীবন কাটানোর এই ঠুনকো অজুহাত কোনভাবেই ধুপে টেকে না।

সামনে পুরো বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত ভয়ংকর সময় অপেক্ষা করছে। এখন আমাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকব, না ইসলাম রক্ষার্থে, মুসলিম জমিন রক্ষার্থে আল্লাহর হুকুম তামিল করতে জিহাদে জান এবং মাল দিয়ে অংশগ্রহণ করব।

ইসলামে মুসলিম নারীদের সম্মান রক্ষার জন্যে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল বাযযাযিয়ায় উল্লেখ আছে, যদি কোন মুসলমান নারী পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে নির্যাতনের শিকার হয়, তাহলে পূর্ব প্রান্তের মুসলমানদের উপরও অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায় সেই নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে উদ্ধার করা।

সুতরাং এই সময়ে আমাদের আলেমদের মতামত কি হবে, যখন হাজার হাজার মুসলমান মেয়েদের তাদের নিজেদের ঘরে ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে। আলেমগণ আফগানের সেই সকল মেয়েদেরকে কি উত্তর দেবেন যারা রাশিয়ান রেড আর্মির হাত থেকে নিজের সম্ভ্রম রক্ষার্থে লাঘমান এলাকার কুনার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখনও যদি মুসলমানরা কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তাহলে সেই দিন বেশি দূরে নয় যেদিন পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলেই মুসলমানদেরকে নির্যাতনের শিকার হতে হবে। আর মুসলমান নারীদেকে তাদের সম্ভ্রম রক্ষায় আত্মত্যাগের পথ বেছে নিতে হবে।

আবু দাউদ-এ বর্ণিত হাদীস, হযরত জাবির (রা.) বলেন– এমন কেউ যে পরিত্যাগ করে আরেকজন মুসলমানকে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে তার সম্ভ্রমহানি হয় এবং তার সম্মান ভুলুণ্ঠিত হয় তাহলে আল্লাহ পরিত্যাগ করে তাকে সে অবস্থায় যে অবস্থায় সে সাহায্যের প্রার্থনা করে; অনুরূপভাবে এমন কেউ যে সাহায্য করে আরেকজন মুসলমানকে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে তার সম্ভ্রমহানি হয় এবং সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয় তখন আল্লাহ তাকে সাহায্য করে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে সে সাহায্যের আশা করে। *[হাদীস হাসান সহীহ আল-জামি : ৫৫৬৬]*

সুতরাং নিজেদের সম্মান ও সম্ভ্রমের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। হিব্বান ইবনে মুসা বলেন, আমরা একবার সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিলাম রিবাতের (মুসলিম ভূমির সীমান্ত প্রতিরক্ষার জন্য) উদ্দেশ্যে। আর আমাদের সাথে ইবনে আল মুবারক। যখন তিনি দেখলেন কি করে মানুষ প্রতিদিন ইবাদত করছে, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে এবং যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করছে, তখন তিনি আমার দিকে

ফিরলেন এবং বললেন– 'আমাদের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব। হায়! জীবনের এতগুলো বছর পার করে দিয়েছি শুধু শুধু; অতিবাহিত করেছি দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত তালাক দেয়ার হুকুম জানতে, এই স্থানের জান্নাতের খোলা দরজাকে ফেলে রেখে।

তিনিই ছিলেন ইবনে আল মুবারক, যিনি প্রতি বছর দু'মাসের জন্যে তার ব্যবসা এবং হাদীসের পাঠ ত্যাগ করে রিবাতে অংশগ্রহণ করতেন। তার ব্যবসা এবং জ্ঞান অর্জনের কারণে তিনি রিবাতে তার জীবনের পুরো সময়টা দিতে না পারায় এই আফসোস করেছিলেন। হায়, যদি তারাই এরকম আফসোস করে তবে তাদের কি হবে যারা আল্লাহর রাস্তায় কোনদিন একটা তীরও ছুঁড়েনি?

যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তার এই অসুস্থতা উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বের সেনাদলকে তার লক্ষ্যে প্রেরণে সাহাবাদের তাগিদ দেয়া থেকে তাকে বিরত রাখতে পারেনি।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যখন আবু বকর (রা.) উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বের সেই যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করতে চাইলেন তখন অন্যান্য সাহাবারা তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেনে। আর তখনই তিনি বিখ্যাত সেই উক্তিটি করেছিলেন– তার শপথ যার কোন শরীক নেই। এমন কি যদি রাস্তার কুকুরগুলোও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের পায়ের সামনে এসে ঘুর ঘুর করে তারপরও আমি সেই সেনাদলকে ফিরিয়ে আনবো না যাকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের অভিযাত্রায় পাঠানোর হুকুম দিয়েছিলেন। *[হায়াতুস সাহাবা ১/৪৪০]*

আর আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবির শেষ উপদেশও ছিল মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের দিকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে। আবু বকর (রা.) তাঁর জীবনের অন্তিমলগ্নে উমর (রা.)কে নিমন্ত্রণ জানালেন এবং তাঁকে বললেন, শোন ওমর! আমি তোমাকে যা বলছি, আমার পরে সেভাবে কাজ করবে। কারণ আমার মনে হয় আমি আজকেই মৃত্যুবরণ করব (দিনটি ছিল সোমবার)। সুতরাং আজকে যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তাহলে সন্ধ্যা তোমাদের নিকট পৌঁছানোর আগেই তুমি মুসলিম উম্মতের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। আর যদি আমি রাত পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সকাল হওয়ার আগেই তুমি নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। দুঃখ, দুর্দশা যত বড়ই হোক সেটা যেন তোমাকে তোমার রবের হুকুম এবং দীনের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর সময় তুমি আমাকে দেখেছ এবং এটা নিশ্চিত পুরো সৃষ্টি এত বড় বিপদে এর আগে কখনও

নিপতিত হয় নি। আল্লাহর কসম! যদি আমি তাঁর প্রেরিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হুকুমও পালনে বিলম্ব করতাম তাহলে আল্লাহ আমাদের পরিত্যাগ করতেন এবং আমাদের ভয়াবহ শাস্তি দিতেন এবং পুরো শহর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। *[হায়াতুস সাহাবা ১/৪৪১]*

প্রকৃতপক্ষেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বোত্তম মানুষ আবু বকর (রা.) উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জিহাদে যোগ দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হুকুম দিয়েছেন তা পালনে বিলম্ব করলে ধ্বংস অনিবার্য।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত কুরআন যা দ্বারা তিনি আমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামদের দেখানো পথ আমাদের সামনে দীন ইসলামে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর গুরুত্বকে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। তা সত্ত্বেও কি এত পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অবধারিত এই মুতওয়াতির বিষয়টি নিয়ে আমাদের অন্য কোন মন্তব্য থাকা উচিত? দুর্জন আজ মুসলমান নারীদের সম্ভ্রমহানি করতে তাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে, আমাদের কি সেই অসহায় নারীদের রক্ষা করা কর্তব্য নয়? সেই নরপিশাচগুলো যখন মূল্যবোধকে দাফন করে আমাদের মা-বোনদের মর্যাদা নষ্ট করছে, আমাদের নৈতিকতাকে সমূলে উৎপাটন করছে, আমরা কি তখন চুপ করে বসে তাদের এই অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেব?

নারীরা আজ বিপন্ন প্রায়
শিশুরা হয়েছে এতিম,
কোথায় সেই বীর সেনাদল
কোথায় আসল মুসলিম?

রাশিয়ানরা প্রায় পাঁচ হাজার দুইশ' আফগান শিশুকে তাদের জিম্মায় রেখেছে। কম্যুনিজমের মতাদর্শ এই শিশুগুলোর মধ্যে প্রবেশ করানোই তাদের মূল লক্ষ্য। তারা এই নতুন প্রজন্মের মাঝে নাস্তিকতার বীজ বপন করে দিতে চায়। এছাড়াও আমেরিকানরা আফগানিস্তানের বাইরে এবং ভেতরে প্রায় ছয়শ'র মত স্কুল পরিচালনা করছে, যেখানে তারা প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছাত্রকে ইংরেজি শিক্ষা প্রদান করছে। এই ক্রান্তিকালে কোথায় ইসলামী শিক্ষা? আর কোথায় আমাদের আলেম সমাজ? তারা এই নতুন প্রজন্মকে কাফেরদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার জন্যে কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

বিশিষ্ট ফুকাহাগণের মতে মুসলমানদের সকল ভূ-খণ্ডগুলো মিলে একটি দেশের মত। সুতরাং যদি এর মধ্যে যে কোন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বিপদের

সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন ইসলামিক উম্মতের পুরো শরীরের অবশ্য কর্তব্য হলো তারা সেই অঙ্গটিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে। আমাদের আলেমদের কি হল যে, জিহাদ ফরজে আইন হওয়া সত্ত্বেও তারা এখনও যুবকদেরকে উৎসাহিত করছেন না জিহাদে যোগ দানের জন্যে। অথচ আল্লাহ বলেন–

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ
يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

আপনি আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করুন; নিজের ভিন্ন অন্যের জন্যে আপনি দায়ী নন। আর মুমিনগণকে জিহাদের জন্য উৎসাহী করে তুলুন। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং আল্লাহ তায়ালা জিহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন ও শাস্তিদানে অতিশয় কঠোর। *[সূরা নিসা : ৮৪]*

আমাদের আলেমদের কি হলো যে তারা তাদের জীবনের একটি বছরও মুজাহিদদের সাথে ব্যয় করতে পারছেন না এবং মুজাহিদীনদের ভুল-ত্রুটি শুধরে দিয়ে তাদেরকে সঠিক পথ বাতলে দিচ্ছেন না? তালিবে ইলম সেই যুবকদেরই বা কি হয়েছে, যারা তাদের শিক্ষাকে একটি বছরের জন্য স্থগিত রেখে নিজের জান এবং মাল দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর প্রেরিত দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার এই মর্যাদা থেকে নিজেদের গুটিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ বলেন, তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুত তারা বোঝে না। কিন্তু রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। *[সূরা তাওবা : ৮৭-৮৮]*

ইমাম সাহেবদের কি হলো যে, যখন কোন যুবক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য তার জান এবং মাল দিয়ে বের হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে তাদের দ্বারস্থ হয়, তখন তারা তাদেরকে ঘরে বসে থাকার পরামর্শ দেয়? আর কত কাল মুসলমান যুবকদেরকে জিহাদের এই সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং তাদেরকে ঘরে আটকে রাখা হবে?

যুবকদেরকে জিহাদে যোগদানে নিষেধ করা এবং সালাত ও সাওম আদায় করতে নিষেধ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যেই সকল ব্যক্তি জিহাদে যোগদানে নিষেধ করে তাদের অন্তর কি সেই আয়াত শুনলে ভয়ে কেঁপে উঠে না যাতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন–

قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا.

আল্লাহ খুব ভাল জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এসো। তারা কমই যুদ্ধ করে। তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরিতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্যে সহজ। *[সূরা আহযাব : ১৮-১৯]*

মায়েদের কি হলো যে তারা তাদের সন্তানদের মধ্যে অন্তত একজনকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে প্রেরণ করছেন না, যাতে করে তাদের সন্তানেরা তাদেরকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে এবং পরকালে আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে সুপারিশ করার মর্যাদা লাভ করতে পারে। তেমনি সেই বাবাদের কি হল? কেন তারা তাদের সন্তানদেরকে মুজাহিদীন বীরদের মাঝখানে জিহাদের ময়দানে বেড়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে? তাদের মনে রাখা উচিত, আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর তার অপার করুণায় তাদেরকে সন্তান-সন্ততি দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন, যাতে তারা এই সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন।

আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কারও পক্ষে কি কিছু সৃষ্টি করা অথবা ইচ্ছেমত সম্পদের মালিক হওয়া সম্ভব? সুতরাং কেন এই হীনমন্যতা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ব্যাপারে?

এছাড়াও মুসলমানদের কি হলো যে তারা কিছু সময়ের জন্যে হলেও মুসলমান ভূমির প্রতিরক্ষায় কিংবা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'য় অংশ নিয়ে তাদের এই কাজগুলো ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখছেন না।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে এসেছে, সালমান (রা.) বলেন– মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষায় একদিন আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারা দেয়া এক মাসের নফল রোযা অপেক্ষা উত্তম। *[রিয়াজুস সালেহীন : ১২৯১]*

আর তিরমিযী শরীফের একটি হাসান হাদীসে এসেছে– আল্লাহর রাস্তায় একদিন মুসলমান ভূমির প্রতিরক্ষায় সীমান্তে পাহারা দেয়া এক হাজার দিনের নফল ইবাদত (প্রতি রাতে নফল নামায এবং দিনের বেলা নফল রোযা রাখা)-এর চেয়েও উত্তম। *[রিয়াজুস সালেহীন : ১২৯৩]*

আরেকটি সহীহ হাদীসে এসেছে– জিহাদের ময়দানে জিহাদের উদ্দেশ্যে এক ঘণ্টা অবস্থান করা ষাট বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। *[আহমেদ, তিরমিযী সহীহ আল জামি : ৪৫০৩]*

সুতরাং হে মুসলমান ভাইয়েরা! আর সময় নষ্ট না করে এগিয়ে আসুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথে, এগিয়ে আসুন বীরদর্পে এবং সন্তুষ্টচিত্তে আপনার দীনের প্রতিরক্ষা বিধান করতে এবং আপনার রবকে বিজয় উপহার দেয়ার নিমিত্তে।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আপনার তরবারিকে এখন কোষমুক্ত করুন। সাওয়ারী প্রস্তুত করুন এবং বীরদর্পে এগিয়ে এসে এই উম্মতকে কলংকমুক্ত করুন। যদি আজ আপনি আপনার দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে এই উম্মতের কি হবে?

নতজানু হয়ে কয়দিন আর
সময় হয়েছে শেষ,
চলে এসো সবে জিহাদের এই পথে
ছুড়ে ফেলো দাসত্বের বেশ।

আল্লাহ বলেন, তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণী[য়] বিষয়। *[সূরা ইউসুফ : ১১১]*

বুখারার সেই রক্তিম কাহিনী, ফিলিস্তিনের মানচিত্র বিকৃত হওয়ার গল্প, স্পেনে[র] মুসলিমদের করুণ পরিণতি, সুদানের সেই মর্মান্তিক ঘটনা; এছাড়া বুলগেরিয়[া], সোমালিয়া, লেবানন, বার্মা, চেচনিয়া, উগান্ডা, জানজিবার, ইন্দোনেশিয়[া], নাইজেরিয়ার মত সকল দেশের আনাচে কানাচে রয়েছে মুসলমানদের কর[ুণ]

পরিণতি এবং আত্মত্যাগের মর্মান্তিক ইতিহাস। এই মর্মান্তিক ইতিহাস ও আত্মত্যাগের গল্পগুলোর মধ্যেই রয়েছে আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আমরা আশা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাশিয়ানদেরকে আফগানিস্তানে পরাজিত করবেন এবং তারা মাথা নিচু করে আফগান থেকে ফিরে যাবে। কিন্তু যদি এর বিপরীত কিছু হয়, তাহলে সেই অঞ্চলের মুসলমানদের ওপর কি পরিমাণ ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে আসবে সেটা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালো জানেন।

আবু উমামা হতে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, যদি কেউ জিহাদের উদ্দেশ্যে বের না হয় অথবা কোন মুজাহিদকে জিহাদের জন্যে সাহায্য না করে অথবা কোন মুজাহিদের পরিবারকে তার অবর্তমানে সাহায্য সহযোগিতা না করে তাহলে কেয়ামত দিবসের পূর্বেই আল্লাহ তাকে ভয়াবহ আযাব দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। *[হাসান আবু দাউদ : ৩/২২ ইবনে মাযাহ : ২/৯২৩]*

এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। *[সূরা কাফ : ৩৭]*

আমি কি আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে পৌছে দেইনি? আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন!

আমি কি আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে পৌছে দেইনি? আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন!

আমি কি আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে পৌছে দেইনি? আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ ভাষণ থেকে নেয়া হয়েছে।

সারাংশ

১. যখন ইসলামের শত্রুরা আধিপত্য বিস্তারের লক্ষে মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, সকল ফুকাহা, মুফাসসিরীন এবং মুহাদ্দিসগণের মতে জিহাদ তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজে আইন হয়ে যায়।

২. সম্মানিত তিন ইমাম- ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেঈ'র মতে, যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় তখন নামায এবং রোজার মত জিহাদও একই কাতারের ফরজ ইবাদত বলে গণ্য হয়। শুধু হাম্বলী মাযহাবে সালাতকেই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়।

৩. জিহাদ যখন ফরজে আইন হয়ে যায় তখন জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন হয় না। যেমন আল্লাহর দেয়া ফরয হুকুমগুলো

(উদাহরণস্বরূপ ফরজ সালাত এবং রমযান মাসের সাওম) পালনের জন্যে পিতা-মাতার অনুমতির দরকার হয় না।

৪. জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার পর বিনা ওজরে জিহাদকে পরিত্যাগ করা এবং রমযান মাসে রোযা না রেখে বিনা ওজরে রোযা ভঙ্গ করার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

৫. জিহাদে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে মুজাহিদীনদের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সহায়তা বা সাদাকা প্রদান করে জিহাদের এই গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব নয়। ফরজ নামায বা ফরজ রোযা ছেড়ে দিলে যেমন তা পুনরায় আদায় না করা পর্যন্ত দান করে বা সাদাকার মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়।

৬. ফরজ নামায এবং ফরজ রোজার মতই জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একবছর রমজান মাসে সম্পূর্ণ রোজা পালন করে পরের বছর রমজান মাসে রোজা ছেড়ে দেয়া অথবা একদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায আদায় করে পরের দিন ছেড়ে দেয়া যেমন ইসলাম অনুমোদন দেয় না, একইভাবে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কোন এক বছর জিহাদে অংশগ্রহণ করার পর অন্য বছর জিহাদকে ওজর ব্যতীত পরিত্যাগ করার অনুমোদনও শরীয়ত দেয় না।

৭. বর্তমানে সেই সকল মুসলিম ভূখণ্ড যা শত্রুদের হস্তগত হয়ে আছে সেখানে জান এবং মাল দ্বারা জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরজে আইন। আর এই জিহাদ ততদিন পর্যন্ত ফরজে আইন থাকবে যতদিন পর্যন্ত না মুসলমানরা তাদের প্রত্যেকটি ভূখণ্ডে আল্লাহর আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

৮. ইবনে রুশদ-এর মতে, জিহাদ শব্দটি যখন স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা হয় তখন তা দ্বারা মূলত সশস্ত্র যুদ্ধকেই বোঝানো হয়ে থাকে। চার মাযহাবের বিশিষ্ট ইমামগণও এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেছেন।

৯. ইবনে হাজার বলেন, ফি-সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে বলতে মূলত জিহাদকেই বোঝানো হয়ে থাকে। *[ফাতহুল বারী : ৬/২২]*

১০. বহুল প্রচলিত একটা কথা আছে, আমরা ছোট জিহাদ থেকে ফিরছি (সশস্ত্র যুদ্ধ) এবং বড় জিহাদের দিকে যাচ্ছি (নফসের জিহাদ)– যা অনেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে বর্ননা করে থাকে; অথচ এটি একটি মিথ্যা, বানোয়াট এবং জাল হাদীস এবং এর কোনই ভিত্তি নেই। এই উক্তিটি ইব্রাহিম ইবনে আবি আবালা নামক এক ব্যক্তির উক্তি যার কোন ভিত্তি নেই এবং যার সাথে বাস্তবতারও কোন মিল নেই। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, এই হাদীসের কোন সঠিক উৎস নেই এবং মুসলমান আলেমদের মধ্যে

কেউ উক্ত জাল হাদীসটি বর্ণনা করেননি। কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল এবং মানুষের মঙ্গলের জন্যেও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল খাতিব আল বাগদাদী এটিকে জঈফ (দুর্বল) বলেছেন একজন বর্ণনাকারীর জন্যে আর তার নাম হলো খালাফ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল খিয়াম। আল-হাকিম এই বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন, 'তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।'

১১. জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া এবং একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি। এর প্রথম ধাপে আছে হিজরত। অতঃপর প্রস্তুতি গ্রহণ, এরপর রিবাত এবং সব শেষে যুদ্ধ। জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সহীহ হাদীসের মার'ফূ সনদে জুনাদা হতে বর্ণিত আছে, 'হিজরত ততদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে।' রিবাতের অর্থ হলো মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্যে মুসলিম ভূখণ্ডের সীমান্তে পাহারায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একজন মানুষ হয়তো অনেক সময় ধরে সীমান্ত প্রহরী হিসেবে কাজ করেছে কিন্তু সশস্ত্র যুদ্ধে খুব কমই অংশগ্রহণ করছেন।

১২. বর্তমান পরিস্থিতিতে জান এবং মাল দিয়ে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমান উম্মতের উপর ফরজে আইন। আর মুসলিম সমাজ ততদিন পর্যন্ত গুনাহর ভাগীদার হতে থাকবে যত দিন না তারা সম্পূর্ণ মুসলিম ভূ-খণ্ড কাফেরদের আধিপত্য থেকে আবার নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে এসে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শুধুমাত্র মুজাহিদীন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকেই এই গুনাহ থেকে দায়মুক্ত করা হবে না।

১৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালের জিহাদসমূহে ভিন্নতা লক্ষণীয়। বদরের যুদ্ধ ছিল মুস্তাহাব কিন্তু তাবুক এবং খন্দকের যুদ্ধ ছিল প্রত্যেক মুসলমানের জন্যেই ফরজে আইন। কাফেররা মদীনা আক্রমণ করেছিল বিধায় প্রত্যেক মুসলমানকে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে সামনে এগিয়ে যাওয়ার হুকুম করা হয়েছিল। খাইবারের যুদ্ধ ছিল ফরজে কিফায়া এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধে শুধুমাত্র তাদেরকেই অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি দেখেছেন।

১৪. সাহাবী এবং তাবেয়ীদের জামানায় যে সকল জিহাদ সংঘটিত হয় তা প্রায় সবই ছিল ফরজে কিফায়া। কারণ তারা নতুন নতুন ভূখণ্ড ইসলামের শরীয়ার ছায়াতলে আনার উদ্দেশ্যে জিহাদ করতেন।

১৫. বর্তমানে জিহাদ ফরজে আইন।

১৬. অসুস্থ ব্যক্তি, পঙ্গু অথবা অন্ধ, শিশু যে বালেগ হয়নি এবং নারী– যাদের হিজরত করার এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই– এ ধরনের কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। বস্তুত অসুস্থ ব্যক্তি, পঙ্গু কিংবা অন্ধ ব্যক্তির জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ না করাই উত্তম কাজ। যদি তারা মুজাহিদীনদের সাথে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদানে সমর্থ হয় এবং তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, সাহস যোগাতে পারে যেমনটি করেছিলেন বিশিষ্ট অন্ধ সাহাবী উম্মে মাখতুম (রা.) উহুদ যুদ্ধের সময়– সে ক্ষেত্রে তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ করাই সর্বোত্তম। এছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ না করার অন্য কোন ওজর আল্লাহর সামনে কাজে আসবে না।

১৭. জিহাদ দলগতভাবে পালনীয় একটি ইবাদত। আর প্রত্যেক দলের অবশ্যই একজন আমির থাকতে হবে এবং আমিরের প্রতি আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তোমরা অবশ্যই শুনবে এবং আনুগত্য করবে– যদিও তা তোমাদের জন্যে সহজ হয় বা কষ্টসাধ্য হয় এবং আনন্দময় হয় অথবা বিস্বাদময় হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাফেলাবদ্ধ হওয়ার কারণ

প্রিয় পাঠক! আজ যে কথাগুলো আপনাদের বলতে চাই সেটি হলো, সংঘবদ্ধ হওয়া। একটি সংগঠন গড়ে তোলা। সংঘবদ্ধ বা সংগঠন এর অর্থ হলো দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীবন।

আল্লাহর হুকুম দীনের কাজ আঞ্জাম দেয় যে সংঘবদ্ধগোষ্ঠী তাকেই বলা হয় ইসলামী সংগঠন। এক সাথে কাফেলাবদ্ধ হয়ে দীন কায়েমের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ। সুসংগঠিত হওয়া ছাড়া আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কখনো কায়েম হতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, কেউ একার পক্ষে কোন দেশ বা রাষ্ট্রে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের পূর্বসুরীরা যেভাবে যে পদ্ধতিতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছে আমাদেরও সে পথের দিকে এগুতে হবে। আজ বিশ্বের যে প্রান্তেই তাকাই দেখতে পাই শুধু মুসলমানরাই নির্যাতিত হচ্ছে, আমাদের কোমলমতি মা-বোনেরা হারাচ্ছে তাদের ইজ্জত। তাদেরকে এ নির্যাতন নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই। আর সে জন্যই আমাদেরকে একত্রিত হতে হবে, কাফেলাবদ্ধ হতে হবে, সুসংগঠিত হতে হবে, বিচ্ছিন্ন থাকা যাবে না। মনে রাখবেন, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েম হতে পারে না। সংগঠিত উদ্যোগ ছাড়া ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের সাধন সম্ভবপর নয়। সাহাবায়ে কেরামগণও কোন যুদ্ধের সময় সবাই একত্রিত হয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে দলবদ্ধভাবে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আর এ সংঘবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মহান রাব্বুল আলামিন বলেন–

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا

তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (অর্থাৎ ইসলামকে) আঁকড়ে ধর। *[সূরা আল ইমরান : ১০৩]*

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আহ্বান করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন জাতি ঐক্যবদ্ধ ছাড়া কাফেলাবদ্ধ হওয়া ছাড়া বা সুসংগঠিত হওয়া ছাড়া তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। তাই আমাদেরও উচিত

সকলে মিলে সুসংগঠিত হয়ে কাফেলাবদ্ধ হয়ে ইসলাম এবং মুসলমানদের দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যে কাফেলা বা সংগঠন গড়ে ওঠে তা মানুষকে আল্লাহর পথে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকে। যারা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে কাফেলা বা সংগঠন তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে সুসংগঠিত শক্তিতে পরিণত করে এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই সংগঠিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই হয় নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করে নতুন সমাজ গঠনের প্রধান উপাদান। এ সংগ্রামের দ্বারা যখন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে তখন সমাজ থেকে সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ জুলুম নির্যাতন সামাজিক ভেদাভেদ এবং অশ্লীলতা দূর হবে। সমাজের সর্বত্র কল্যাণের প্লাবন সৃষ্টি হবে। অশান্তি আর অস্বস্তির অভিশাপ থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করবে। তাই আমি সকল মুসলমানকে আহ্বান জানাবো, আপনারা একতাবদ্ধ হয়ে যান, বিশ্বের বুকে কুরআন এবং সুন্নাহর দেয়া নির্দেশিত পন্থায় ইসলামী হুকুমত কায়েম করার লক্ষ্যে কাফেলাবদ্ধ হয়ে যান।

দলবদ্ধ বা কাফেলাবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে রাসূল সা.

দলবদ্ধ কাজের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ اَلْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ
وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّه مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ
رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِه اِلَّا اَنْ يَّرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوٰى جَاهِلِيَّةٍ فَهُوَ مِنْ
جُثٰى جَهَنَّمَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى؟ قَالَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى
وَزَعَمَ اَنَّه مُسْلِمٌ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি; আল্লাহ আমাকে এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ বিষয়গুলো হলো– কাফেলাবদ্ধ হওয়া, আমিরের নির্দেশ শ্রবণ করা, আমীরের নির্দেশ পালন, হিজরত করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি কাফেলার বাইরে চলে যায় সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি উঠিয়ে নিল। তবে সে যদি কাফেলায় আবার ফিরে আসে তবে ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে আহ্বান জানায় সে জাহান্নামী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস

করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালাত কায়েম এবং সাওম পালন করা সত্ত্বেও? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সালাত কায়েম, সাওম পালন এবং মুসলিম বলে দাবি করা সত্ত্বেও।

[হারিছ আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিরমিযী, আস সুনান, কিতাবুল আমছাল : ২৭৯০ : আহমদ, আল মুসনাদ, মুসনাদুল হারিছ আল আশ'আরী : ১৬৫৪২ : ১৭১৩২; আল হাকিম, আল মুসতাদরাক, কিতাবুল ইলম : ৩৭১ : কিতাবুস ছাওম : ১৪৮২]

তিনি আরো বলেন–

لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.

তিনজন লোক কোন নির্জন প্রান্তরে থাকলেও একজনকে আমির না বানিয়ে থাকা উচিত নয়। আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত। *[আহমদ আল-মুসনাদ, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস : ৬৩৬০]*

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

তিনজন লোক সফরে বের হলে তারা যেন তাদের একজনকে আমির বানিয়ে নেয়। *[আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আবু দাউদ, আস সুনান কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং : ২২৪২ : আবু আওয়ানাহ, আল মুস্তাখারাজ, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং : ৬০৯৪]*

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ

যে ব্যক্তি জান্নাতের সর্বোত্তম অংশে বসবাস করতে চায় এবং তার মধ্যে আনন্দিত হতে চায় সে যেন দলবদ্ধ বা কাফেলাকে আঁকড়ে ধরে। *[উমর উবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। শাফি'ঈ, আল-মুসনাদ : ১১২৬]*

وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। *[আহমদ, আল মুসনাদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হাদীস নং : ৫২৯২, ৬১৩৫, ইবনু আওয়ানা, আল মুস্তাখরাজ, কিতাবুল উমারা, হাদীস নং : ৫৭৭৪]*

যে কারণে কাফেলাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ

কাফেলাবদ্ধ ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়া দল নেই। আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই। *[দারিমী, আস সুনান, আল মুকাদ্দামাহ, হাদীস নং : ২৫৭]*

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে এটাই প্রমাণিত হয়, যে কোন কাজের ক্ষেত্রে কাফেলাবদ্ধ হওয়াটা জরুরী। যেমন-

মুমিনদেরকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে।

এককভাবে জীবনযাপন করার অধিকার তাদের নেই।

একক জীবনযাপনকারী শয়তানের শিকারে পরিণত হয়।

সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন জান্নাত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত।

কাফেলা বদ্ধ হয়ে না থাকলে ইসলামের উপর আঘাত আসলে তা প্রতিহত করা কঠিন।

কাফেলাবদ্ধ জীবনযাপন ইসলামে শুরু থেকেই চলে আসছে।

শুধু তাই নয়, আজ গোটা পৃথিবীর সকল মুসলমান কাফের-বেঈমানদের হাতে নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে; তাদের হাত থেকে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে হলে কাফেলাবদ্ধ হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। কারণ মনে রাখতে হবে একতাবদ্ধই হলো বিশাল একটি ক্ষমতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবাদেরকে নিয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতেন এবং কোন যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে দলবদ্ধ হয়ে যেতেন। আজ যদি বিশ্বের সকল মুসলমান এক হয়ে যায় তবে সকল রাজত্ব চলে আসবে মুসলমানদের হাতে। এটা কাফেররাও বুঝে। এ কারণেই তারা মুসলমানরা যেন ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে এর জন্য তাদের সকল ষড়যন্ত্রই কায়েম রেখেছে। মনে রাখবেন, দশ মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে যে কাজটি করতে পারবে একার পক্ষে সেটা অনেক কঠিন। এমনিভাবে আজ যদি আফগানিস্তান, চেসনিয়া, বসনিয়া, পাকিস্তান বা যে কোন দেশের মাত্র কয়েক হাজার মানুষ কাফেলাবদ্ধ হয়ে একজনকে আমির বানিয়ে সহীহ নিয়তে আল্লাহর উপর ভরসা করে মাঠে কাজ করতে শুরু করে তবে অবশ্যই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে দেশে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে- এতে কোন সন্দেহ নেই। আর সেখানে আল্লাহর সাহায্যও পাওয়া যাবে। তাই আমাদের উচিত, কাফেলাবদ্ধ হয়ে বদরের সাহাবীদের ন্যায় আজ থেকেই মাঠে নেমে পড়া এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত মাঠে ময়দানে যে যেখান থেকে পারে সেখান থেকে কাজ করা। আর এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই আয়াত-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না অশান্তি দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়; অতঃপর যদি তারা ক্ষান্ত হয়। তবে অত্যাচারীগণ ব্যতীত কারো সাথে শত্রুতা নেই। /*বাকারা : ১৯৩*/

ঐ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়া যে পর্যন্ত সমাজ থেকে পাপাচার এবং শয়তানী শক্তি দূর হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা না হয়। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

কাফেলাবদ্ধ হওয়ার সময় কি এখনও হয়নি

গোটা বিশ্বেই আজ মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হতে দেখেও যদি আমাদের রক্তে আগুন না ধরে, কুরআনের পাতা পুড়ে ভস্ম করার মত মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটার পরও যদি আমরা জাগ্রত না হই, তাহলে জিহাদ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলোর উপর কবে আমল করব? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ও আদর্শের উপর কবে চলব? আর কবেই বা আমরা কাফেলাবদ্ধ হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে বাস্তবায়িত করে মা-বোনদের আত্মচিৎকার বন্ধ করতে পারবো? তবে সম্ভব যদি কুরআনের মধ্যে কিতাল ও জিহাদ সম্পর্কিত যেসব আয়াত দৈনিক আমরা তেলাওয়াত করছি, সে আয়াতগুলো কোন সময়ের জন্য নাযিল হয়েছিল? আজকের এ দুর্যোগপূর্ণ ও সংকটময় মুহূর্তেও যদি আমরা জিহাদের কাজ শুরু না করি, তাহলে আমাদের এ ইলম আর কাজে আসবে কবে?

বন্ধুগণ! আজ কুফরী শক্তি যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। যখন ইচ্ছা আলেম সমাজ ও দীনি মাদ্রাসার ছাত্র, ইসলামী বিদ্যাপীঠ ও সাধারণ মুসলমানসহ গোটাবিশ্বের ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন রকম হুমকি দিচ্ছে, কুৎসা রটাচ্ছে। এরপরও কি কাফেলাবদ্ধ হওয়ার সময় হয়নি? তবে আর কবে হবে? হে মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ! আমরা তো সেই বাহাদুর নবীর ওয়ারিশ, যিনি হুনাইনের রণাঙ্গনে চার হাজার তীরের মুখে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে জিহাদী তারানা পাঠ করেছিলেন–

أنا النبيُّ لا كذب أنا ابن عبد المطلب

নিঃসন্দেহে আমি সত্য নবী, আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

তাহলে আমরা কেন কুফরী চক্রের হুমকিতে ভয় পাব। আজ ইহুদীরা আমাদের উপর মোড়লী করছে। মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। ইহুদী গোষ্ঠী খায়বর যুদ্ধের নির্মম পরাজয়ের কথা ভুলে গিয়েছে। মুহাম্মদী আরাবীর দুরন্ত মুজাহিদ কাফেলা আবার জিহাদের শপথ নিয়েছে, তাদের শপথ-দৃপ্ত শ্লোগানে কেঁপে কেঁপে উঠছে পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা ও শহর-বন্দর।

خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود

... ওরে ইহুদী গোষ্ঠী! খায়বরের নির্মম পরাজয়ের কথা আবারও মনে কর! যখন মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীর মুজাহিদরা তোমাদের উপর হামলা করেছিল... হ্যাঁ, অতি শিগগিরই সে মুজাহিদ কাফেলা আবার ধেয়ে আসছে।

আমরা জিহাদের পথে কোনরূপ অন্যায়-অবিচারের পক্ষপাতী নই। মানবরচিত কোন মতবাদ, মতাদর্শ আমরা মানি না। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয়। আমাদের জিহাদ কোন আঞ্চলিকতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের এ কাফেলা কোন দেশ বা গোত্র ভিত্তিক নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমান আজ এক কাতারে আসা উচিত। আমাদের এ কাফেলা পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়া উচিত।

لا شرقية ولا غربية اسلامية اسلامية

পূর্ব পশ্চিমের সীমানা মাড়িয়ে ইসলামকে পৌছে দেব আমরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে।

والله يا رجال انا حامل بندوقية

اسلامية اسلامية جهادية جهادية

হে বিশ্ববাসী, শুনে রাখ! ইসলামের জন্য জিহাদের জন্য আমরা অস্ত্র তুলেছি, গোটা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তবে ক্ষান্ত হব আমরা।

وكتابُ الله بايدينا تقتحمُ اليابسَ والاخضرَ

আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন আমাদের হাতে রয়েছে। আমাদের জিহাদী পদচারণায় সরব হয়ে উঠবে গোটা পৃথিবী।

এসো কাফেলাবদ্ধ হই

যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয় তারা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যায়, আর আল্লাহও তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। আর আল্লাহ যাদের সাহায্যকারী হয়ে যান তাদেরকে দুনিয়ার কোন শক্তিই পরাভূত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এভাবে যারা আল্লাহর সাহায্যকারীর তালিকাভুক্ত হয়ে যায় তারাই আল্লাহর অলি হিসেবে গৃহীত হয়। যারা এ অলিদের বিরোধিতা করে, আল্লাহ নিজে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। হাদীসে কুদসীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশ বর্ণনা করে বলেন–

مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

যে আমার অলিদের সাথে শত্রুতা করে, আমি তাকে যুদ্ধের আহ্বান জানাই।

আর এ যুদ্ধ কখনোও একার পক্ষে সম্ভব নয়; এর জন্য দরকার একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী বা দলের। যারা কিনা সর্বদাই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে বিষয়ে ফিকির করবে। শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম রহ. এক ভাষণে বলেছিলেন যে, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যদি আমার হাতে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারী ও শাহাদত কামনাকারী দু'হাজার মুজাহিদ থাকে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা ইসরাঈলকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবো। প্রশ্ন আসতে পারে আমরা কীভাবে ইসরাঈল পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হবো? এর উত্তর একটাই, যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদের সততা ও নিষ্ঠা দেখেন, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য পথ খুলে দিবেন, যেমন খুলে দিয়েছেন আফগানিস্তানে। চিরঞ্জীব আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, তিনি এখানে বলেছেন দু'হাজার মুজাহিদ থাকলে পরেই ইসরাঈলকে ধ্বংস করতে পারবো; এখানে একথা বলেননি যে একজনের দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আজই এ মুহূর্তেই আমাদেরকে কাফেলাবদ্ধ হয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত, তা নাহলে আল্লাহর কাছে আমাদের জবাব দেয়ার আর কিছুই থাকবে না।

মনে রাখতে হবে, ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাধা-প্রতিবন্ধকতা, বিপদ-মুসিবত যা আসে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই আসে। তাই যাদের অন্তরে সঠিক ঈমানের আলো আছে, তারা এসব মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে না।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ.

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া, নির্দেশ ছাড়া তো কোন বিপদ আসতেই পারে না। আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আল্লাহ তাদের অন্তরকে সঠিক হেদায়াত দান করেন। *[আত তাগাবুন : ১১]*

প্রকৃত পক্ষে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথে এমন একটা মুহূর্ত তো আসতেই হবে যেখানে পৌঁছে আন্দোলনের মুজাহিদগণ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কোন কিছুর উপরই নির্ভর করবে না, করতে পারবে না। এমনি মুহূর্তেই আল্লাহর নৈকট্য লাভের মুহূর্ত মেরাজের মুহূর্ত। দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কাফেলার সঙ্গী-সাথীগণ যখন এ পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম হয়, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাদের বিজয় দানের ফায়সালা করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

যারাই আমার পথে সংগ্রাম সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকি। *[আনকাবুত : ৬৯]*

এ ঘোষণার পর এটাই স্পষ্ট হয় যে, দীন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের সুযোগ পাওয়াটা আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ গভীর জ্ঞানের অধিকারী, আল্লাহ জেনে বুঝেই এ মেহেরবানী প্রদর্শন করে থাকেন। কারা আল্লাহর এই বিশেষ মেহেরবানী পাওয়ার যোগ্য, তাও আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার তৌফিক দান করুন। আমিন!

কাফেলাবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কাফেলাবদ্ধ হয়ে যে আন্দোলন করা হবে তা কেবলই আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পন্থায় মানব সমাজে কায়েম করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই কাফেলাবদ্ধ হওয়ার মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় হচ্ছে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্য সাধন করা। আর মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে আব্দ হিসাবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক আত্মগঠন, পরিবার গঠন, দল গঠন ও রাষ্ট্র গঠন।

মনে রাখতে হবে, ইসলামী খেলাফত দুনিয়ার বুকে মানুষের জন্য অতি বড় একটি নিয়ামত। যে জনগোষ্ঠী এই নিয়ামতের কদর করতে প্রস্তুত নয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খামাখাই তাদেরকে এত বড় নিয়ামত দান করেন না। তাই যুগে যুগে দুনিয়ার অকৃতজ্ঞ জাতিগুলো ইসলামী খেলাফতের মত নিয়ামত থেকে বঞ্চিতই থেকে গেছে।

অকৃতজ্ঞ মানবগোষ্ঠী ইসলামী খেলাফতের একটি খাস নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকলেও তাতে কিন্তু আল্লাহর পথের মুজাহিদদের ব্যর্থতার কিছুই নেই। কারণ যারা ইখলাসের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে দুনিয়া থেকে শহীদ হয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন এবং আখেরাতে তাদের জন্য রেখেছেন মহা পুরস্কার। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে, যারা আজকের দুনিয়াতে জিহাদকে অস্বীকার করে কিংবা তা থেকে দূরে সরে থাকতে চায় ভয়ের কারণে বা দুনিয়ার লোভ লালসা যাদেরকে আঁকড়ে ধরেছে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। কোথায় আজকের দিনের আলেম সমাজ? কেন আজ তারা বসে আছে মসজিদের কোণে! ঘরের কোণে! তারা কি কুরআন পড়ে আলেম হয়নি? যেখানে প্রায় ৬৬৬টি আয়াত রয়েছে জিহাদের ব্যাপারে! আজ গাইরে আলেমগণ ছুটে চলেছে আলেমদের পিছনে জিহাদের ময়দানের দাওয়াত দিতে অথচ এ কাজটি ছিলো আলেমদের! কি হলো আজ মুসলমানদের, আজ মুসলমানরা সেই কুচুরিপানার ন্যায় হয়ে গেছে যেটির ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুকাল পূর্বেই বলে গেছেন–

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول لثوبان: كَيفَ أَنتَ يَا ثَوبَانُ! إِذْ تَدَاعَتْ عَلَيكُمُ الأُمَمُ كَتَدَاعِيكُم عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ يُصِيبُونَ مِنهُ؟. قال ثوبان: بأبي وأمّي يا رسول الله! أَمِنْ قلَّةٍ بنا؟ قال: لاَ؛ أَنتُمْ يَومَئِذٍ كَثِيرٌ. وَلَكِن يُلْقَى فِي قُلُوبِكُمُ الوَهَنُ. قالوا: وما الوهَن يا رسول الله؟! قال: حُبُّكُمُ الدُّنيَا وَكَرَاهِيَتُكُمُ القِتَالَ.أخرجه أحمد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وإسناده جيّد.

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'শিগগিরই মানুষ তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য আহবান করতে থাকবে,

যেভাবে মানুষ তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে-অন্যকে আহবান করে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো?' তিনি বললেন, 'না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত বয়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্ত র থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহ্হান ঢুকিয়ে দিবেন।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল-ওয়াহ্হান কি?' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং কিতালকে অপছন্দ করা।' *[মুসনাদে আহমদ : ১৪/ ৮৭১৩; হাইসামী বলেছেন-হাদীসটির সনদ ভালো, শুয়াইব আল আরনাউতের মতে হাদীসটি হাসান লি গাইরিহি। জামউ যাওয়ায়েদ : ৭/ ৫৬৩]*

প্রিয় পাঠক! আমাদেরকে আর কচুরিপানার ন্যায় থাকা চলবে না; বরং আমাদেরকে চলতে হবে বাঘের ন্যায়।

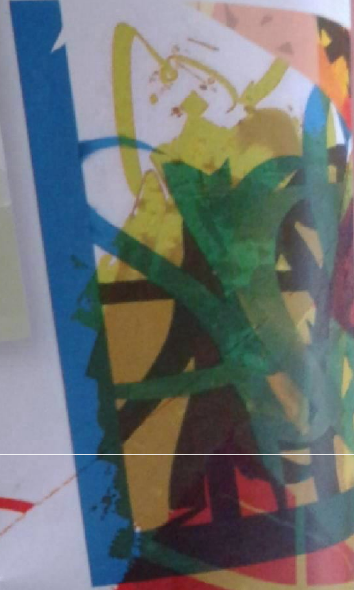
স মা প্ত

শাইখ ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ.

যুবক ভাইদের প্রতি বিশেষ

বার্তা







বইঘর

ISBN : 984-70168-0070-2



এসো কাফেলাবদ্ধ হই

Esu Kafelaboddho Hoi

শাইখ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.